وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ‘অচিরেই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের (বিজাতীয়) রীতিনীতি অনুসরণ করা শুরু করবে- বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে)। এমনকি যদি তারা গুইসাপের গর্তেও ঢুকে যায়, তবে তোমরাও তাতে ঢুকে যাবে...’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩২১০)।

● ৮ম বর্ষ ● ৬ষ্ঠ সংখ্যা ● এপ্রিল ২০২৪

Web : www.al-itisam.com

সম্পাদকীয়

আমাদের মানসিকতার পরিবর্তনে রামাযানের শিক্ষা কতটা ফলদায়ক?

প্রবন্ধ

সূরাতুল ক্বদর: এক মহমান্বিত রজনির গল্প

ঈদের মাসায়েল

বর্তমানে প্রচলিত পহেলা বৈশাখ

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٨، رمضان و شوال ١٤٤٥هـ/ أبريل ٢٠٢٤م العدد: ٦، الجزء: ٩٠
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

মাকতাবাতুস সালাফ
কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

সিলসিলা ছহীহা!
(সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহা)
২য় খণ্ড
সিলসিলা ছহীহার হাদীছসমূহ তাখরীজ ছাড়া ফিক্বহী ধারায় বিন্যস্ত
মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

উছমানী ক্বায়েদা
উছমান ইবনে আফফান কুরআন গবেষণা কেন্দ্র

ফিকহুস সালাফ
(আহলুল হাদীছ ও সালাফী মানহাজের ফিকহ)
১ম খণ্ড
আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী রাহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ ও সম্পাদনা: আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

কিতাবুদ-দাওয়াহ
আদর্শ শিক্ষা
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

মাকতাবাতুস সালাফ | সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী ।
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭

তুবা পাবলিকেশন কতৃক সদ্য প্রকাশিত

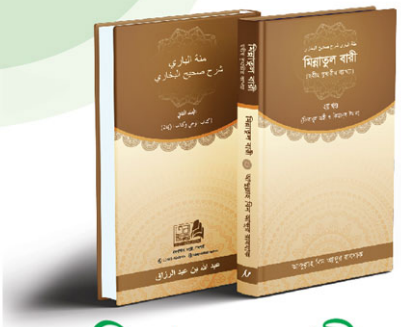

মিন্নাতুল বারী
২য় খণ্ড (কিতাবুল অহী ও কিতাবুল ঈমান)
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সদাচরণ
(যে আমলে জান্নাত মেলে)
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে ভিজট করুন tubapublication.com

রাজশাহী
নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০

৮ম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

এপ্রিল ২০২৪
চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩০-১৪৩১
রামাযান-শাওয়াল ১৪৪৫

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◆ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান সম্পাদক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◆ তরিকুল ইসলাম ◆ আল আমিন
◆ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার: রাসেল আহমেদ

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১
জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
» হালাল উপার্জন এবং আমাদের সতর্কতা! ০৪
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» হিজাবোফোবিয়া বনাম পর্দা ও প্রগতি ০৬
-মো. হাসিম আলী
» কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাহার ০৯
-এস এম আব্দুর রউফ
» রামাযানের শেষ দশকের আমল ও লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত ১৩
-মাহবূবুর রহমান মাদানী
» জবাব ও ইসলামপন্থা ১৪
-মুস্তফা মনজুর
» সমাজসংস্কারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ১৬
-নাজমুল হাসান সাকিব
» ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত ১৯
-মো. দেলোয়ার হোসেন
» চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ছিয়াম ২২
-মো. কায়ছার আলী
» সূরাতুল ক্বদর: এক মহমান্বিত রজনির গল্প ২৩
-মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার
» ঈদের মাসায়েল ২৫
-আল-ইতিছাম ডেস্ক
» বর্তমানে প্রচলিত পহেল বৈশাখ ২৮
-মো. জাকির হোসাইন

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» শিক্ষকের ভূমিকা এবং তার প্রতি ছাত্র ও সমাজের কর্তব্য ৩০
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ
» সমকামিতা ও ট্রান্স জেন্ডার: সাম্রাজ্যবাদীদের নীল নকশা ৩৩
-মাযহারুল ইসলাম

◈ দিশারী
» তোমরা রেখো গো স্মরণ, একদিন হবে যে মরণ! ৩৬
-জাবির হোসেন

◈ ইতিহাসের পাতা থেকে
» জেরুযালেম ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা (পর্ব-৬) ৩৯
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

◈ কবিতা ৪৩

◈ সংবাদ ৪৪

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৬

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী
সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০
www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

www.al-itisam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

আমাদের মানসিকতার পরিবর্তনে রামাযানের শিক্ষা কতটা ফলদায়ক?

মমতাময় আদর্শে ঘেরা, গ্রামীণ জীবনের পবিত্র ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ, ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ একসাথে মিলেমিশে থাকার গ্রামীণ দৃশ্য এখন আর দেখা যায় না। ছোট্ট শিশুদের মাঠে-ঘাটে গোবর, শস্য ও কালবৈশাখী ঝড়ে আম কুড়ানোর দৃশ্য এখন আর নাই। আর্থ উপার্জনের জন্য খুব সকালে কাজের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের বেরিয়ে যাওয়া আর হয় না। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে ভোরে বরকত ও প্রাচুর্য দান করো' *(আবূ দাঊদ, হা/২৬০৬)*। পঞ্চায়েত প্রথার নির্মল স্বচ্ছ মমতাময়ী সামাজিক বন্ধন এখন অনুপস্থিত। দ্বন্দ্ব-কলহের সমাধানে গ্রাম্য বিচারব্যবস্থা এখন উঠে গেছে। নৈতিক আদর্শ ধরে রাখার দৃশ্য এখন প্রায় অনুপস্থিত। যদিও গ্রাম্য প্রথার বাঁকে বাঁকে নির্যাতনের চিত্র বিদ্যমান ছিল।

একটা সময় ছিল, যখন গ্রামের মানুষের পারস্পারিক ও সামাজিক বন্ধন এমন গভীর ছিল যে, কোনো একজন মানুষ আহত বা বিপদগ্রস্ত হলে, সবাই তাকে সাহায্যের জন্য ছুটে যেত, কিন্তু এখন সে অবস্থা আর নাই। এখন পাশের বাসার মানুষটির মৃত্যু হলেও কোনো খবর রাখা হয় না। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন' *(মুসলিম, হা/২৫৮০)*। গাছের ফল, জমির ফসল, বাড়ির উঠানে বেড়ে উঠা শাকসবজি প্রতিবেশী, পথিক ও অসহায়কে অকাতরে বিতরণ করা হতো। কারণ, সে সমাজে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বাণী, 'যে কোনো মুসলিম যখন কোনো গাছ লাগায় অথবা ফসল বোনে অতঃপর তা হতে কোনো পাখি, মানুষ অথবা পশু (তার ফল ইত্যাদি) খায়, তখন ঐ খাওয়া ফল-ফসল তার জন্য ছাদাক্বাস্বরূপ হয়' *(মুসলিম, হা/১৫৫৩)* —এর শিক্ষা বাস্তবায়ন হতো।

এলাকার স্বার্থে, মানুষের কল্যাণে, দেশের সেবায় কাজ করা হতো। কবর খনন, রাস্তা মেরামত, অসহায় পরিবারকে সাহায্য ইত্যাদি কাজের কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হতো না। কারণ, এগুলোকে মহৎ কাজ মনে করা হতো। জীবনের পরবর্তী পর্যায়গুলো আরও সুন্দর, মধুর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হওয়ার ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক ফলাফল আছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা আমাকে দুর্বলদের মধ্যে খোঁজো। কেননা তোমরা তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমে রিযিক্ব ও সাহায্য পেয়ে থাকো' *(আবূ দাঊদ, হা/২৫৯৪)*। কিন্তু এই আদর্শের বাস্তবায়ন বর্তমান সমাজে নাই।

ছেলেমেয়ে কিশোর বয়সেই পরিবারকে সাহায্য করত। জমি চাষ, গবাদিপশু পালন, মাছ শিকার ইত্যাদি কাজ করে তারা পারিবারিক সচ্ছলতায় অবদান রাখত। কারণ, অর্থ উপার্জনের প্রতি উপদেশ দিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'মানুষ নিজ হাতের যে উপার্জন খায় তার চেয়ে উত্তম কোনো খাদ্য হতে পারে না' *(বুখারী, হা/২০৭২)*। কিন্তু বর্তমানে তারা বাবার কষ্টে উপার্জিত টাকায় ক্রয়কৃত স্মার্টফোনে টিকটক দেখে। লেখাপড়ার পরিবর্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। আগে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ছিল রক্ষণশীল। ধর্মীয় আদর্শ ও পারিবারিক কঠোর বাধ্যবাধকতায় জীবন ছিল নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মক্তব, যানবহন ও আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে নারী-পুরুষের মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় ছিল। সমাজের প্রত্যেক সদস্যের উপর পরিবারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল। পরিবারে সেই রক্ষণশীলতা এখন আর নাই। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'দাইয়ুছ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। দাইয়ুছ ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারে পাপ সংঘটিত হতে সাহায্য করে' *(নাসাঈ, হা/২৫৬১)*।

পারিবারিক জীবনে সচ্ছলতা লাভে মানুষের চেষ্টা সর্বদা চলমান। স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের জন্য তার সংগ্রাম অব্যাহত। এভাবে একসময় সে ধর্মীয় আদর্শকে এড়িয়ে যায়। ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের গণ্ডি থেকে সে ধীরে ধীরে বের হতে থাকে। সুখী জীবনের অলীক স্বপ্নে সে পরকালকে ভুলে যায়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে সে সুখের ভিত্তি মনে করে। অর্থ উপার্জনের প্রচণ্ড নেশায় সে প্রবাসে পাড়ি জমায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী' *(আল-আ'লা, ৮৭/১৬-১৭)*। কিন্তু সেখানে আল্লাহভীতি কিংবা লোকলজ্জা কোনোটাই তাকে পতিতালয়ে গমন বা অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক থেকে বাধা দেয় না। এমনকি একান্ত নির্জনে যৌনক্ষুধা মিটাতে হারাম পথ অবলম্বন থেকে সে বিরত থাকে

না। অপরদিকে তার বিবাহিত স্ত্রীও প্রতিবেশী কিংবা পরপুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জাড়িয়ে পড়ে। ফলে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক থাকার কথা, যেখানে সত্য ও আবেগের প্রচণ্ড প্রভাব থাকার কথা, যেখানে দুজনের মমত্ববোধ আরো গভীর হওয়ার কথা, সেখানে অবিশ্বাস আর প্রতারণার দানা বাঁধে। এভাবে অর্থসম্পদের প্রচণ্ড লোভ আর ধর্মহীনতা একটি প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেয়।

একটা সময় এমন ছিল, যেখানেই অন্যায় হতো সেখানেই একজন যুবকের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হতো, কিন্তু বর্তমানে সেটা আর হয় না। যেখানে তার সত্যের পেছনে ছোটার কথা, সেখানে সে এখন নীরব দর্শক। যেখানে তার অন্যায়কে প্রতিহত করার কথা, সেখানে সে নিশ্চুপ। যেখানে তার মন ও চেতনায় প্রতিবাদের ঝড় থাকার কথা, সেখানে সে ভীতু ও সন্ত্রস্ত। তাকে প্রতিবাদের কথা বলা হলে, সে সমাজের এমন চিত্রকে স্বাভাবিক মনে করে।

কোন অজানা ভীতি তার এ চেতনাকে ধ্বংস করে দিল! কোন শক্তি তার এ ইলাহীকে আদর্শকে বিলীন করে দিল! কোন অদৃশ্য শক্তি ‘মিথ্যা বলা চরম অপরাধ’ তার এমন বোধকে স্তিমিত করে দিল! যে তরুণ বা তরুণী অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে তার সততা ও চারিত্রিক নিদর্শন মনে করত, কোথায় গেল তার এ চেতনা?

এখন সমাজে জনপ্রতিনিধিকে যা কিছু করতে দেখা যায়, তার বেশির ভাগই লোক দেখানো। সে বলে, সে সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য করে, কিন্তু সে স্বার্থ ছাড়া কিছুই করে না। কারণ, জনগণের উপর প্রভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাকে এসব করতে হয়। ক্ষমতা প্রদর্শন এবং নিজের অন্যায়কে আড়াল করা থাকে এর পিছনের উদ্দেশ্য।

মাহে রামাযানের শিক্ষা ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা। ছিয়াম সাধনা করে ধৈর্য ও আত্মসংযমের শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকে এ মাসে। খাদ্য গ্রহণের আবাধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকার শিক্ষা হয় এ মাসে। ফলে অসহায় ও দুঃখী মানুষের কষ্ট অনুভব করা যায়। সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া, উদারতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সমাজ চিত্র ভিন্ন। একজন মানুষের যেখানে মানবিক হওয়ার কথা, যেখানে ক্রেতার প্রতি উদার হওয়ার কথা, যেখানে সাধারণের প্রতি মানবিক হওয়ার কথা, সেখানে সে তাদের উপর কঠোর হয়, অর্থ আয়ের নানান কৌশল অবলম্বন করে এবং তার অপরাধপ্রবণতা আরও বেড়ে যায়।

রামাযান আসে আমাদের নিকট রহমত, বরকত ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে। জীবন পরিবর্তনের বিশাল সুযোগ নিয়ে। নিজেকে বদলিয়ে ফেলার অফুরন্ত উপায় নিয়ে। কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর ইত্যাদি নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তার ব্যাপক আয়োজন নিয়ে। আমাদের অবশ্যই ছিয়াম সাধনা করে ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত হবে। পোশাক কেনার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে অসহায়-দরিদ্র মানুষের সহায়তায় অর্থ ব্যয় করবে। দামী খাদ্য খাওয়ার অভ্যস ত্যাগ করে মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা ও আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করতে হবে। রামাযান মাস উপলক্ষ্যে অতি মুনাফা অর্জনের পথ বর্জন করে উদারতা ও মানবিকতার পথ অবলম্বন করতে হবে। এমন যদি করতে না পারা যায় তবে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের পরিবর্তে নিয়ে আসব অন্য এক সম্প্রদায়। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না’ *(মুহাম্মাদ, ৪৭/৩৮)*।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দেশের সর্বস্তরের মানুষকে তাদের জীবনের পরিণাম সম্পর্কে ভাববার তাওফীক্ব দান করো। প্রত্যেকের জীবনের কিছু সময় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার সুযোগ করে দাও। প্রত্যেকেই রামাযানের কল্যাণ সমানভাবে উপভোগ করার ক্ষমতা দান করো। প্রত্যেককে সমালোচনা, অন্যায়, অবিচার ও হারাম উপার্জন ইত্যাদি থেকে বিরত রাখো। অন্যের দোষ না খুঁজে নিজের দোষ খোঁজার ক্ষমতা দান করো। অন্যের পেছনে না লেগে আয়নায় নিজের পাপগুলো দেখে বিরত থাকার ক্ষমতা দান করো। ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের অহেতুক সমালোচনা থেকে রক্ষা করো। চারিত্রিক উৎকর্ষতা আর মহানুভবতার উদার শিক্ষা লাভে আমাদের ধন্য করো। আত্মকেন্দ্রিক হয়ে অহংকার ও অহমিকার পথ বর্জন করে সত্য পথে আসার সক্ষমতা দান করো। আমীন! *(স.)*

হালাল উপার্জন এবং আমাদের সতর্কতা!

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَأَنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]، وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

সরল অনুবাদ: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না। তিনি মুমিনদের ঐ আদেশ দিয়েছেন, যে আদেশ তিনি রাসূলদের দিয়েছেন। সুতরাং তিনি রাসূলগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন, সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫১)*। আর তিনি মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার করো’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৭২)*। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘপথ সফর করে, এলোকেশ ও ধূলিময় বেশে আকাশের দিকে হাত প্রসারিত করে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার রব! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হয় হারাম উপায়ে। সুতরাং এমন ব্যক্তির দু‘আ কীভাবে কবুল হতে পারে?’[১]

ব্যাখ্যা: দু‘আ হচ্ছে হৃদয়ের বাগান এবং আত্মার প্রশান্তি। কারণ দু‘আ বান্দা ও তার রবের মধ্যে একটি যোগসূত্র, যার মাধ্যমে সে রহমত লাভ করে এবং অত্যাচারীর উপর বিজয় অর্জন করে। দু‘আ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যা একজন দাঈর উচ্চ মর্যাদা লাভ নিশ্চিত করে; যাকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের উৎস ও ভিত্তি বানিয়েছেন। দু‘আ যেহেতু আল্লাহর নৈকট্য ও মর্যাদা লাভের অন্যতম মাধ্যম, তাই বান্দার এমন উপকরণ অবলম্বন করে দু‘আ করা উচিত, যা তাকে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলে। তার মধ্যে হালাল খাদ্য ও পোশাক অন্যতম। তার খাদ্য এবং পোশাক যেন হালাল হয়, সে ব্যাপারে তাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। এই হাদীছে এ বিষয়ে তাকে সতর্ক করা হয়েছে।

উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো, আল্লাহ পবিত্র আর তিনি পবিত্র ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না। তিনি সকল অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত। তিনি উত্তম, বিশুদ্ধ ও পবিত্র। পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের গুণাবলি দ্বারা তিনি গুণান্বিত। এই গুণাবলি সর্বদা তাঁর মধ্যে বিরাজমান। যেহেতু তিনি পবিত্র, তাই পবিত্র ছাড়া তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না। তিনি এমন আমল গ্রহণ করেন, যা পবিত্র এবং শিরক ও লোক দেখানোর অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। যে সম্পর্কে তিনি তাঁর পবিত্র কিতাবে ঘোষণা করেছেন, ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ‘সুতরাং যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন ভালো কাজ করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে’ *(আল-কাহফ, ১৮/১১০)*।

তেমনি মহান আল্লাহ পবিত্র ও হালাল উপার্জন ব্যতীত কোনো ইবাদত গ্রহণ করেন না। এজন্যই ছাদাক্বার আলোচনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও ছাদাক্বা করে আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না, তার ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন (যদিও তাঁর উভয় হাতই ডান হাত)। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্বশাবককে প্রতিপালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের সমপরিমাণ হয়ে যায়’।[২]

মহিমান্বিত আল্লাহ পবিত্র বাণী ব্যতীত গ্রহণ করেন না। যেমন তিনি বলেছেন, ‘তাঁরই দিকে উত্তম বাক্য আরোহণ করে’ *(ফাত্বির, ৩৫/১০)*। যাতে একজন মুমিনের জন্য উপার্জনের ঐ পবিত্র পথ বাস্তবায়িত হয়, যা সে কামনা করে। কারণ পবিত্র জীবিকা অর্জনের জন্য তার আগ্রহী হওয়া উচিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ ‘তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার করো এবং সৎকাজ করো’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫১)*। একজন মুসলিমকে যে আদেশ দেওয়া হয়,

---

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১৪১০; ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৪।

যদি তিনি তা মেনে চলেন, তবে তিনি এমন মনস্তাত্ত্বিক প্রশান্তি এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভ করবেন, যা তাকে তার প্রভুর নিকটবর্তী করে। ফলে এটি তার দু'আ কবুলের সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

পক্ষান্তরে বান্দার তার মনকে এমন কিছু থেকে দূরে রাখতে হবে যার খাওয়া, পান করা বা পরিধানকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। কারণ যা হারাম, তা তাকে ধ্বংসের কেন্দ্রে অবতরণ করাবে। যেমন এ ক্ষেত্রে নবী ﷺ বলেছেন, 'যে দেহের গোশত হারাম খাদ্যে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম খাদ্যে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামই সর্বাধিক উপযুক্ত স্থান'।[৩]

আমাদের ন্যায়পরায়ণ পূর্বপুরুষ রাহিমাহুমুল্লাহ থেকে এমন অনেক সদুপদেশ বর্ণিত হয়েছে, যা ঐ মহান অর্থের প্রতি তাদের আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়। মায়মূন ইবনু মেহরান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাক্বী নয় যতক্ষণ না সে জানে যে তার পোশাক, খাদ্য এবং পানীয় কোন্ উৎস থেকে এসেছে'।[৪] উহাইব ইবনু ওয়ারদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আপনি যদি এই খুঁটির মতো জড়পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, এতে আপনার কোনো উপকার হবে না, যতক্ষণ না আপনি দেখবেন আপনার পেটে যা প্রবেশ করছে তা হালাল না হারাম।[৫] আর ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আনুগত্য আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহের অন্যতম। তবে তার চাবি হচ্ছে দু'আ এবং চাবির দাঁত হচ্ছে হালাল খাদ্য।[৬]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির মহান দৃষ্টান্ত পেশ করলেন, যিনি দু'আ কবুলের উপকরণ অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তিনি যা খান তার কোন্টা হালাল আর কোন্টা হারাম তার বাছবিচার করেন না।

প্রথমত, 'তিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন' সফরের সময় দু'আ কবুল হয়ে থাকে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত হাদীছে নবী ﷺ বলেছেন, 'তিনটি দু'আ সন্দেহাতীতভাবে কবুল করা হয়। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ, ছিয়াম পালনকারীর দু'আ ও মুসাফিরের দু'আ'।[৭] মুসাফিরকে ভ্রমণের সময় অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। ভ্রমণকালে কষ্টের ফলস্বরূপ তার দু'আ কবুলের নিকটবর্তী হয়।

দ্বিতীয়ত, 'ধুলায় ধূসরিত' দ্বারা তার অবস্থানগত নিচুতা ও অভাবকে নির্দেশ করে। কারণ আকৃতি ও পোশাকে তার সাদামাটা অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এমন অবস্থার সম্মুখীন ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ এতে আল্লাহর প্রতি তার আত্মসমর্পণ এবং মুখাপেক্ষিতা বেশি প্রকাশ পায়।

তৃতীয়ত, 'হাতকে আকাশে প্রসারিত করা' এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ তাঁর নিকট হাত প্রসারিত করে, তবে তিনি তার হাতকে ফিরিয়ে দেন না। নবী ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা খুবই লজ্জাশীল ও উদার। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর নিকট হাত তুলে, তখন তাকে হতাশ করে তার হাত ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জা পান'।[৮]

চতুর্থত, 'হে প্রভু! হে প্রভু!' বলে আল্লাহর নিকট চাওয়ার ক্ষেত্রে যে বিনয় প্রকাশ করা হয়েছে, তা দু'আ কবুলের অন্যতম বড় উপায়। এজন্যই নবী ﷺ কোনো কিছু চাইলে তিনবার চাইতেন।[৯]

উক্ত হাদীছে উল্লেখিত চারটি উপকরণের প্রত্যেকটিই দু'আ কবুলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এমন প্রতিবন্ধকতা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে, যা দু'আ কবুলের পথকে বন্ধ করে দেয়। উপকরণগুলো ধ্বংসের একমাত্র উৎস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'কীভাবে তার দু'আ কবুল করা হবে?' বিস্ময়কর অবস্থা ও অসম্ভব ঘটনাকে প্রকাশ করতে এরূপ প্রশ্নবোধক বাক্য আরবী ভাষায় ব্যবহার করা হয়।

পরিশেষে, আমরা যেন আমাদের মনকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারি সেজন্য আমাদের সাধনা করতে হবে। আমাদের উপার্জন, খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হালাল কি-না তা সর্বদা যাচাই করতে হবে। যাতে আল্লাহর কাছে আমাদের দু'আ কবুল হয়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন সর্বদা আমাদেরকে তাঁর হালাল জীবিকা দ্বারা সমৃদ্ধ করেন এবং হারামমুক্ত করেন। আমরা যেন অবাধ্যতা থেকে ফিরে তাঁর আনুগত্য করতে পারি এবং অন্যের থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র তাঁর অভিমুখী হতে পারি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৩. আহমাদ, হা/২৭৭২।
৪. ওয়াক্বী ইবনুল জাররাহ, কিতাবুয-যুহদ, পৃ. ৫০১।
৫. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২৬৩।
৬. আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী, কিতাবু ইহইয়াও উলূমিদ্দীন, ২/৯১।
৭. আবূ দাঊদ, হা/১৫৩৬, হাসান; তিরমিযী, হা/১৯০৫; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৬২।
৮. তিরমিযী, হা/৩৫৫৬, হাদীছ ছহীহ।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

www.al-itisam.com

হিজাবোফোবিয়া বনাম পর্দা ও প্রগতি

-মো. হাসিম আলী*

হিজাব আল্লাহ তাআলার ফরয বিধান। হিজাব নারীর প্রতীক এবং মর্যাদার পরিচায়ক। এটি তাদের অলংকার তুল্য। তাদের উন্নতি ও প্রগতির সোপান। তাদের আত্মসম্মান ও সম্ভ্রমের সুরক্ষাকবজ। ইসলামী পর্দাব্যবস্থা ও হিজাবের কল্যাণকর দিক প্রতিভাত ও প্রমাণিত হওয়ার পরও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও মুসলিমবিদ্বেষী কিছু জ্ঞানপাপী হিজাব তথা পর্দা সম্পর্কে বিষোদগার করছে। ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষীদের মুখোশ উন্মোচনপূর্বক ইসলামী পর্দার স্বরূপ ও সুফল তুলে ধরার প্রয়াসে বক্ষমাণ আলোচনা।

হিজাবের বিধান :

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের হিজাবের ব্যবস্থা মেনে চলা ফরয। কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি বিধানের মতো হিজাবও সুস্পষ্ট একটি ফরয বিধান। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে হিজাবের আদেশ দিয়ে বলেন, ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ‘ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, এমন বালক যারা গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ‘নারীদের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভিতা করে তোলে’।[১]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট যে, বিবাহ বৈধ পুরুষদের সামনে সর্বাবস্থায় নারীদের জন্য হিজাব তথা পর্দা পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

হিজাবের বিধান কেন?

ইসলাম একটি ইলাহী জীবনব্যবস্থা, তাই এ জীবনব্যবস্থার বিধিবিধানগুলো নির্ভুল এবং চিরকল্যাণকর। আবার ইসলাম স্বভাবজাত জীবনব্যবস্থা, তাই এর সকল বিধান মানুষের জন্য সহজসাধ্য এবং মানবস্বভাব ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রত্যেকের ব্যাপারে সাধারণ বিবেক ও শারীরিক সুস্থ মন যে পথ অবলম্বন করে, ইসলামও সেটাই অবলম্বন করে। ইসলামের কোনো বিধান বিশেষ বোঝাস্বরূপ বা প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা করতে চান না’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও জলবায়ু, প্রাকৃতিক গঠন ও পরিবেশ, সৌন্দর্য ও স্বচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আত্মিক পবিত্রতা ও দৈহিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম হিজাবের ব্যবস্থা দিয়েছে। বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায়ও ইলাহী বিধান হিজাবের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সুপ্রমাণিত। এককথায়, মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও নৈতিক সুষমা এবং সামাজিক সুস্থতা রক্ষার জন্য ইসলাম হিজাবের বিধানকে ফরয বা অবশ্য পালনীয় হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

হিজাবের গুরুত্ব ও উপকারিতা :

(১) হিজাব মানবজাতির জন্য আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার :

পোশাকের বিধান স্বয়ং মহান স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এর উদ্দেশ্য ইযযত-আব্রুর গ্যারান্টি দেওয়া এবং সৌন্দর্য বর্ধন করা, সর্বোপরি তাক্বওয়ার সাজে সজ্জিত হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ ‘হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং সৌন্দর্যবর্ধন করে। আর তাক্বওয়ার পোশাকই সর্বোৎকৃষ্ট’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/২৬)*।

---

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

১. তিরমিযী, হা/১১৭৩, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৩১০৯।

(২) হিজাব নিরাপত্তার প্রতীক : হিজাবধারী নারীর সৌন্দর্য অপ্রকাশিত থাকে। তাই মানুষের লোলুপদৃষ্টি তাদের দিকে সহজে পড়ে না। এজন্য একজন হিজাবধারী নারী নিজেকে অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে পারেন।

(৩) হিজাব যুবক ও তরুণ প্রজন্মের রক্ষাকবচ : নারী-পুরুষের পাস্পরিক আকর্ষণ স্বভাবজাত ও সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত। হিজাব নারী-পুরুষের এ আকর্ষণের মাঝে বাধা হিসেবে কাজ করে। ফলে যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক স্খলন ও চারিত্রিক মহামারি থেকে রক্ষা পায়। যে সমাজে হিজাবের প্রচলন যত বেশি, সে সমাজের যুবক-যুবতিরা তত বেশি চরিত্রবান।

(৪) হিজাব অশ্লীলতার প্রতিরোধক : অশ্লীলতা হলো সামাজিক ক্যান্সার, যার প্রকাশ ঘটে পর্দাহীনতার মাধ্যমে। ক্যান্সার যেরূপ কোনো ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, অনুরূপভাবে হিজাব বা পর্দার অনুপস্থিতিও পুরো যুবসমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেয়।

(৫) আত্মমর্যাদা ও শুদ্ধতা রক্ষার হাতিয়ার : হিজাব বিশ্বের বিনীত ও সচ্চরিত্রবান মুসলিম মহিলাদের এবং মন্দ চরিত্রের মহিলাদের মধ্যে একটি পার্থক্যকারী দেওয়ালের মতো কাজে করে। এর মাধ্যমেই চেনা যায় কে ভালো চরিত্রের অধিকারী আর কে কলুষিত চরিত্রের অধিকারী। যেকোনো লম্পটও হিজাবধারী নারীকে অপেক্ষাকৃত বেশি সম্মান ও সমীহ করে থাকে।

(৬) হিজাব ইভটিজিং এবং ধর্ষণ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে আর বিশ্বাসীদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)*।

২০১৩ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, হিজাব পরা নারীদের ধর্ষণের হার ০.০৩%, যেখানে হিজাব না পরা নারীদের ধর্ষণের হার ৫৮%।

(৭) হিজাব নারীকে মূল্যবান সম্পদে পরিণত করে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ 'দুনিয়ার সব কিছুই সম্পদ; কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো সতীসাধ্বী নারী'।[২]

২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৭

(৮) হিজাব পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করে : যে সমাজে হিজাব বা পর্দার কদর যত বেশি, সে সমাজে পারিবারিক কলহ তত কম। হিজাবী নারীদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক থাকে খুবই মধুর। অন্যদিকে পর্দাহীন নারীদের মধ্যে আত্মহত্যা, ডিভোর্সের সংখ্যা অনেক অনেক গুণ বেশি। অন্যদিকে পর্দাহীন নারীদের মাঝে স্বাধীনতার নামে থাকে স্বেচ্ছাচারিতা।

(৯) হিজাব নৈতিক চরিত্রের সংরক্ষক : পর্দাহীনতার কারণে আজ বিভিন্ন দেশে আত্মপ্রদর্শনীর সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় প্রতিটি সমাজে পরকিয়া, চরিত্রহীনতা, অশ্লীলতা, বেহায়পনা, নির্লজ্জতা, অপকর্ম ও ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট ব্যাধির সংক্রমণ ব্যাপক হারে বাড়ছে। পশ্চিমা অনেক দেশেই নারীকে পণ্যের মতো দেখা হয়। তাই সেখানে নারী প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও যৌনসন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে, যা পত্র-পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ে। সুতরাং নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণে ইসলামী হিজাব ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

(১০) আত্মিক সুরক্ষা ও পবিত্রতা : নারী-পুরুষের আকর্ষণ স্বভাবজাত, প্রাকৃতিক। এটি স্রষ্টার বড় নেয়ামত। এ আকর্ষণের কারণে উভয়ে পরস্পরের কাছ থেকে লাভ করেন সুখ ও প্রশান্তি। আর এ বিজ্ঞানময় ব্যবস্থাপনার কারণে অটুট আছে মানব বুনিয়াদ। আবার এ আকর্ষণের জন্যই আল্লাহ নারীদেরকে তার সৌন্দর্যকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার জন্য হিজাব বা পর্দার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখতে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন' *(আন-নূর, ২৪/৩০)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'আর তোমরা যখন তার (নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের) কাছে কিছু চাও তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও, এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৩)*।

(১১) মনস্তাত্ত্বিক পরিপক্কতা : হিজাবের শেকড় মানুষের মননের গভীরে প্রোথিত। এটি নারীদের মানসিক পরিপক্কতার সাথে জড়িত। সৃষ্টিগতভাবে নারী তার সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী। হিজাবের বিধান নারীকে তার এ সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী চলতে সাহায্য করে।

হিজাব বনাম উন্নতি ও প্রগতি :

অনেক জ্ঞানপাপী ও ইসলামবিদ্বেষীরা মনে করে হিজাব বা পর্দাপ্রথা সামাজিক উন্নতির পথে বড় বাধা। কারণ এতে

সমাজের অর্ধাংশ অচল হয়ে পড়ে। তারা সমাজ উন্নয়নে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না। এসব অজ্ঞ ও মূর্খদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করি, উন্নতি ও প্রগতি বলতে কী বুঝায়?

নারীরা ঘরের বাইরে, অফিসে, আদালতে, ক্লাবে এবং পাবলিক প্লেসে গেলেই কি শুধু উন্নতি হয়? এটাই কি প্রগতির একমাত্র সোপান? না-কি একাগ্রতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারার মধ্যে উন্নতি ও সমৃদ্ধি রয়েছে, যা প্রকৃতিগতভাবেই নারীদের অর্পণ করা হয়েছে। নারীদের আসল দায়িত্ব হলো, তারা সমাজ ও জাতিকে উত্তম প্রজন্ম সরবরাহ করবে, যা আগামী সমাজ বিনির্মাণ করতে পারবে। আর তা তখনই সম্ভব হবে, যখন নারীরা নিজের চারিত্রিক সুষমা সুরক্ষিত রেখে একাগ্রতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে। নারী উন্নতির মাপকাঠি পশ্চিমাদের চোখে দেখলে চলবে না, দেখার প্রয়োজনও নেই। বরং উন্নতির মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ যা স্থাপন করেছেন, সেটা।

ইসলাম নারীকে প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। নারী ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় পড়ালেখা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল বৈধ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

শারঈ হিজাব এবং ফ্যাশান :

হিজাব পরিধান করার পরও যদি দেহের অঙ্গসমূহ প্রকাশ পায়, তবে সেটা ফ্যাশন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতা হলো, আমাদের সমাজের নারীদের মধ্যে পশ্চিমা সংস্কৃতির চর্চা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। তাদের তৈরি যে কোনো স্টাইলিস্ট পোশাক এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, নারীদের পর্দার সবচেয়ে বড় হাতিয়ারকেও তারা ফ্যাশন বানিয়ে ফেলেছে। হিজাব বা পর্দার নামে বাজারে তৈরি বাহারি ডিজাইনের বোরকা পাওয়া যাচ্ছে, যাতে নারীদের শরীরের আকৃতি খুব সহজেই অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়, ফলে পর্দার আসল উদ্দেশ্যই (পরপুরুষ থেকে রূপলাবণ্যকে গোপন রাখা) বিনষ্ট হয়। পর্দা রক্ষার সর্বোত্তম উপকরণ বোরকাগুলোকে ঢাল বানিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় তারা সেগুলোকে সাধারণ মানুষের ঈমান হরণের প্রথম অস্ত্র বানিয়েছে। এভাবে সাধারণ মুসলিমরা খুব সহজেই তাদের ফাঁদে পা রাখছে। তাদের অনুসরণে পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য হিজাবে আবৃত কিছু নারী কড়া বডি স্প্রে মেখে রাস্তায় বেরুচ্ছে। এসব স্টাইলিস্ট হিজাবধারী নারীদের কাছ থেকেও সর্তক ও সজাগ থাকা সচেতন মানুষের জন্য জরুরী।

আমাদের নারীদের একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শারঈ পর্দার ক্ষেত্রে শুধু প্রচলিত হিজাব পরা যথেষ্ট নয়; নিজেদেরকে দৃষ্টি নিম্নমুখী করে আনা এবং নম্রতার দিকে পরিচালিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাজগোজ না করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু সুগন্ধির ব্যবহার যদি বাতাসে ভেসে পুরুষকে আকর্ষণ করে তাও নিষিদ্ধ।

হিজাব বিতর্কের অন্তরালে :

কিছু নাস্তিক, সাম্প্রদায়িক, সুশীল এবং চরিত্রহীন নারীলোভী ব্যক্তি হিজাব নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকে। তাদের এ বির্তকের অন্তরালে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। যেমন—

(১) হিজাব বিতর্কের মূল অনুঘটক হলো ইসলামোফোবিয়া।

(২) ইসলামের সৌন্দর্য ও কল্যাণকর দিকের প্রতিহিংসা ও অসহিষ্ণুতা।

(৩) বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের উত্থান ও নবজাগরণকে প্রতিরোধ করার বৃথা চেষ্টা।

(৪) বিজয়ী শক্তি হিসেবে মুসলিমদের আত্মপ্রকাশ করার সম্ভবনাকে নস্যাৎ করা।

(৫) ইসলাম ও মুসলিমদের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংসের নীল নকশা এবং কথিত শুদ্ধি অভিযান।

(৬) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়ানের মাধ্যমে মুসলিম নিধন।

(৭) ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

(৮) ব্যক্তি স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ।

(৯) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিলোপ সাধন।

(১০) সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানোর প্রয়াস।

(১১) অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার মতো শয়তানী প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন।

(১২) মুনাফিক্ব ও ইসলামবিদ্বেষীদের হীনস্বার্থ সংরক্ষণ।

(১৩) বাংলাদেশকে হিন্দুত্ববাদী দেশে রূপান্তরের চেষ্টা।

(১৪) পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লাগিয়ে রাজনীতির খেলায় বিজয়ী হওয়া।

সুতরাং এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হিজাব বা পর্দা আল্লাহ তাআলার ফরয বিধান। হিজাব নারীর সম্মানের প্রতীক এবং মর্যাদার পরিচায়ক। এটি তাদের অহংকার ও অলংকার তুল্য। এটি নারীর উন্নতি কিংবা প্রগতির বাহন; অন্তরায় নয়। যারা হিজাব ইস্যুতে অনর্থক বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে, তারা ইসলাম ও মুসলিমদের চিহ্নিত দুশমন। তাদের ইচ্ছা বা স্বপ্ন কোনোদিনই বাস্তবায়িত হবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ‘তারা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো (ইসলামকে) নিভিয়ে দিতে, আর আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান করবেনই, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে’ *(আছ-ছফ, ৬১/৮)*।

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাহার

-এস এম আব্দুর রউফ*

ভূমিকা : কুরআন মাজীদ ইসলামী শরী'আতের সকল তথ্যের উৎস। কুরআন যারা মানেন এবং যারা মানেন না, তারা সকলে কুরআনের বহুমুখী হেদায়াত থেকেই আলো নিয়েছেন। বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু তথ্য রয়েছে কুরআন মাজীদে। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্য নেই। কুরআনে রয়েছে সমাজবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, সমরবিজ্ঞান, নভোমণ্ডল ও ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান প্রভৃতি। তাছাড়া রয়েছে জীবনের বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখাগত বিজ্ঞান।

কুরআনের বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ : নিচে কুরআনের কিছু বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

(১) বিশ্বজগৎ সৃষ্টি : জগৎ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসেবে বলা হয়, কোটি কোটি বছর পূর্বে বিশ্বজগৎ একটি অখণ্ড জড়বস্তুরূপে বিদ্যমান ছিল। পরে তার কেন্দ্রে একটি মহাবিস্ফোরণ ঘটে, যাকে বিগ-ব্যাং বলা হয়। সেই মহাবিস্ফোরণের ফলে আমাদের সৌরজগৎ, ছায়াপথ, তারকারাজি ইত্যাদি সৃষ্টি হয় এবং বিনা বাধায় সর্বত্র সন্তরণ করে চলে। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই এ তথ্য প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেন, ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ 'কাফেররা কি দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পরে মিলিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩০)*।

প্রশ্ন হলো, বিস্ফোরণ ঘটালো কে? সেখানে প্রাণের সঞ্চার হলো কীভাবে? অতঃপর বিশাল সৃষ্টিসমূহ অস্তিত্বে আনলো কে? যদি কেউ বলে যে, প্রেস মেশিনে বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং তা ধ্বংস হয়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। অতঃপর সেখানে তৈরি হয়েছে বড় বড় গবেষণাগ্রন্থ। একথা কেউ বিশ্বাস করবে কি? না। তাহলে উত্তর হলো সেই সত্তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন।

(২) প্রাণীর সৃষ্টিতত্ত্ব : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ 'তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, সে সম্পর্কে কেবল বলেন, 'হও'; ফলে তা হয়ে যায়' *(আল-বাক্বারা, ২/১১৭)*।

প্রাণের উৎস কী?

এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পানি থেকেই প্রাণীজগতের উদ্ভব। অথচ কুরআন একথা আগেই বলেছে, ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ﴾ 'আমরা জীবন্ত সবকিছু সৃষ্টি করেছি পানি হতে। তবুও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩০)*।

প্রশ্ন হলো, পানি সৃষ্টি করল কে? অতঃপর তার মধ্যে প্রাণশক্তি এনে দিল কে? আল্লাহ বলেন, ﴿وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ 'আর আল্লাহ পানি থেকে প্রত্যেক প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ বিচরণ করে পেটে ভর দিয়ে, কেউ বিচরণ করে দুই পায়ে হেঁটে আবার বিচরণ করে চার পায়ে ভর দিয়ে। যা কিছু তিনি চান সৃষ্টি করেন, তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপর শক্তিশালী' *(আন-নূর, ২৪/৪৫)*।

(৩) জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি : বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিটি জিনিস জোড়ায় বিদ্যমান। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই এ তথ্য দিয়েছে, ﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ﴾ 'মহাপবিত্র সেই সত্তা, যিনি ভূ-উৎপন্ন সকল বস্তু, মানুষ ও তাদের অজানা সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন' *(ইয়াসীন, ৩৬/৩৬)*।

(৪) মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ 'আর আমরা হাতসমূহ দ্বারা আকাশ নির্মাণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা মহাসম্প্রসারণকারী' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৪৭)*।

(৫) মহাকাশ বিজ্ঞান : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ 'দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল সবকিছুর মালিক ও পালনকর্তা তিনিই' *(আর-রহমান, ৫৫/৬)*। অর্থাৎ সূর্য পূর্ব দিকের দুটি প্রান্তে উঠে এবং পশ্চিম দিকের দুটি প্রান্তে অস্ত যায়। আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ 'তুমি পাহাড়গুলোকে মনে করছ স্থির হয়ে আছে, কিন্তু এগুলো মেঘের মতো চলমান থাকে। এ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্য, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা যা করছ, সে সম্পর্কে তিনি জানেন' *(আন-নামল, ২৭/৮৮)*।

সূর্যের নিজস্ব অক্ষ রয়েছে, এটি আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। আল্লাহ বলেন, ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ 'সূর্যের জন্য চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের দিনের ওপর অগ্রবর্তী হওয়া সমীচীন নয়। আর প্রত্যেকেই মহাশূন্যের কক্ষপথে সন্তরণ করছে' *(ইয়াসীন, ৩৬/৪০)*।

(৬) পদার্থবিজ্ঞান : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ 'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত ওপরে তার কাছে যায় এমন একদিনে, যার পরিমাপ তোমাদের

* পিএইচডি গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

গণনায় এক হাজার বছর' *(আস-সাজদাহ, ৩২/৫)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ﴾ 'ফেরেশতারা এবং রূহ তার দিকে উঠে যায় এমন এক দিনে, যা ৫০ হাজার বছরের সমান' *(আল-মা'আরিজ, ৭০/৪)*। অর্থাৎ সময় আপেক্ষিক।

পৃথিবীতে যত লোহা আছে, তার সবই এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে। একমাত্র সুপার নোভার বিস্ফোরণে মহাবিশ্বে লোহা সৃষ্টি হয়, যা উল্কার মাধ্যমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ 'আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীযান নাযিল করেছি, যাতে মানুষ ইনছাফ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর লোহা নাযিল করেছি, যার মধ্যে বিরাট শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাঁকে এবং তাঁর রাসূলদেরকে না দেখে সাহায্য করে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী' *(আল-হাদীদ, ৫৭/২৫)*।

ব্ল্যাকহোল (নক্ষত্র যেখানে ধ্বংস হয়) সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে কুরআনে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ 'আমি শপথ করছি তারকাসমূহের পতিত হওয়ার স্থানের' *(আল-ওয়াক্বি'আহ, ৫৬/৭৫)*।

পালসার (যা অতি তীব্র ছিদ্রকারী গামারশ্মি বিচ্ছুরণকারী তারকা) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ - النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ 'কসম আকাশের এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। তুমি কি জানো রাতে আত্মপ্রকাশকারী কী? তা হলো উজ্জ্বল তারকা' *(আত্ব-ত্বারেক্ব, ৮৬/১-৩)*।

আগুন জ্বালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি করে গাছের সবুজ পাতা। আল্লাহ বলেন, ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ﴾ 'তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালিয়ে থাকো' *(ইয়াসীন, ৩৬/৮০)*।

বৃষ্টির পানির ফোঁটা মাটিতে পড়ে মাটির কণাগুলো আয়নিত করে ফেলে, যার কারণে কণাগুলো 'ব্রাউনিয়ান গতি'-এর কারণে স্পন্দন করা শুরু করে। তারপর আয়নিত কণাগুলোর ফাঁকে পানি এবং অন্যান্য জৈব পদার্থ আকৃষ্ট হয়ে জমা হয় এবং মাটির কণাগুলো ফুলে যায়। আল্লাহ বলেন, ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ 'আর তোমরা যমীন শুষ্ক দেখতে পাও, তারপর যখন আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সেটি আলোড়িত ও স্ফীত হয় এবং সব রকমের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে শুরু করে' *(আল-হাজ্জ, ২২/৫)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ 'আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি নাযিল করেছি। অতঃপর তা দ্বারা বাগান ও খাদ্যশস্য উৎপন্ন করেছি' *(ক্বাফ, ৫০/৯)*। অর্থাৎ মেঘের পানিতে মৃত জমিনকে জীবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে। সমুদ্রের পানির উপরে ০.১ মিলিমিটার মোটা স্তর থাকে, যাতে বিপুল পরিমাণে জৈব বর্জ্য পদার্থ থাকে, যা মৃত শৈবাল এবং প্ল্যাঙ্কটন থেকে তৈরি হয়। এই বর্জ্য পদার্থগুলো ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট, লেড শোষণ করে। এই স্তরটি পানি বাষ্প হওয়ার সময় পানির পৃষ্ঠটানের কারণে পানির কণার সাথে চড়ে মেঘে চলে যায় এবং বৃষ্টির সাথে বিপুল পরিমাণে পড়ে মাটির পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থগুলো সরবরাহ করে।

(৭) পানিচক্র ও মহাকাশ বিজ্ঞান : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ 'তুমি কি দেখোনি, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, তারপর সেগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার মাঝখান থেকে বৃষ্টিবিন্দু নির্গত হয়। আর তিনি আকাশে স্থিত মেঘমালার পাহাড় থেকে শিলা বর্ষণ করেন, তারপর যাকে চান এর দ্বারা আক্রান্ত করেন এবং যাকে চান এর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎ চমক দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়ার উপক্রম হয়' *(আন-নূর, ২৪/৪৩)*।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ 'আল্লাহই বাতাস পাঠান, ফলে তা মেঘ উঠায়, তারপর তিনি যেভাবে চান এ মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন, তারপর তুমি দেখো বারিবিন্দু মেঘমালা থেকে নির্গত হয়। অতঃপর যখন এ বারিধারা তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে থেকে যার ওপর চান বর্ষণ করেন তখন তারা আনন্দোৎফুল্ল হয়' *(আর-রূম, ৩০/৪৮)*।

মেঘ অত্যন্ত ভারী, একটি বড় আকারের মেঘ ১১ লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত ওযন হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ 'তিনিই তোমাদের সামনে প্রদর্শন করান বিজলি, যা দেখে তোমাদের মধ্যে আশঙ্কার সঞ্চার হয় আবার আশাও জাগে এবং তিনিই ভারী মেঘ সৃষ্টি করেন' *(আর-রা'দ, ১৩/১২)*। তিনি আরো বলেন, ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ 'আর আল্লাহই বায়ুকে স্বীয় অনুগ্রহের পূর্বে

সুসংবাদরূপে পাঠান। তারপর যখন সে পানি ভরা মেঘ ধারণ করে তখন আমরা তাকে কোনো মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালিত করি অতঃপর তার মাধ্যমে আমরা বারি বর্ষণ করি তারপর তার মাধ্যমে আমরা সব ধরনের ফল-ফলাদি উৎপাদন করি। এভাবেই আমরা মৃতদেরকে পুনরুত্থিত করি যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৭)*।

আকাশ পৃথিবীর জন্য একটি বর্মস্বরূপ যা পৃথিবীকে মহাকাশের ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ 'আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ, অথচ তারা এর নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩২)*। আল্লাহ আরো বলেন, ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ 'তিনিই তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন, আকাশকে বানিয়েছেন ছাদস্বরূপ, আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর তোমাদের জীবিকা হিসেবে তার মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের ফল উৎপন্ন করেন। কাজেই তোমরা জেনেশুনে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না' *(আল-বাক্বারা, ২/২২)*।

সমুদ্রের নিচে আলাদা ঢেউ রয়েছে, যা উপরের ঢেউ থেকে ভিন্ন। আল্লাহ বলেন, ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ 'অথবা তার উপমা যেমন একটি গভীর সাগর বুকে অন্ধকার। ওপরে ছেয়ে আছে একটি তরঙ্গ, তার ওপরে আর একটি তরঙ্গ আর তার ওপরে মেঘমালা অন্ধকারের ওপর অন্ধকার আচ্ছন্ন। যেখানে কোনো মানুষ নিজের হাত বের করলে তাও প্রায় দেখতে পায় না। যাকে আল্লাহ আলো দেন না তার জন্য আর কোনো আলো নেই' *(আন-নূর, ২৪/৪০)*।

বৃষ্টির পরিমাণ সুনির্ধারিত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ আর যিনি আসমান থেকে পরিমিত পানি বর্ষণ করেন এবং তার মাধ্যমে আমরা মৃত ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলি। এভাবেই তোমাদের পুনরুত্থান করা হবে' *(আয-যুখরুফ, ৪৩/১১)*।

পৃথিবীতে প্রতি বছর যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তার পরিমাণ ৫১৩ ট্রিলিয়ন টন এবং ঠিক সমপরিমাণ পানি প্রতি বছর বাষ্প হয়ে মেঘ হয়ে যায়। এভাবে পৃথিবী এবং আকাশে পানির ভারসাম্য রক্ষা হয়।

মিষ্টি ও লবণাক্ত দুই সাগরের মাঝে অনতিক্রম্য ব্যবধান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ 'দুটি সমুদ্রকে তিনি পরস্পর মিলিত হতে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল হয়ে আছে, যা তারা অতিক্রম করে না' *(আর-রহমান, ৫৫/১৯-২০)*।

(৮) জীববিজ্ঞান : মৌমাছির একাধিক পাকস্থলী আছে, কর্মী মৌমাছিরা স্ত্রী বা পুরুষ নয়। মধুর অনেক ঔষধি গুণ আছে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ - ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ 'তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন যে, পাহাড়ে, বৃক্ষে আর উঁচু স্থানে বাসা তৈরি করো। অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার করো, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পন্থা অবলম্বন করো। অতঃপর তার পেটসমূহ থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়, যাতে মানুষের জন্য আছে আরোগ্য। নিশ্চয়ই চিন্তাশীল মানুষের জন্য এতে নিদর্শন আছে' *(আন-নাহল, ১৬/৬৮-৬৯)*।

গাভী খাবার হজম হবার পর তা রক্তের মাধ্যমে একটি বিশেষ গ্রন্থিতে গিয়ে দুধ তৈরি করে, যা আমরা খেতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ 'আর তোমাদের জন্য গবাদিপশুর মধ্যেও শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে তোমাদের পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক' *(আন-নাহল, ১৬/৬৬)*।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে মানুষের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ জীবনযাপন করে পিপীলিকা। তারা মানুষের মতোই সামাজিক জীবনযাপন করে এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ 'এমনকি যখন তারা সবাই পিপীলিকার উপত্যকায় পৌঁছল, তখন একটি পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকারা! তোমাদের গর্তে ঢুকে পড়ো, যাতে অজান্তেই সুলায়মান ও তাঁর সৈন্যরা তোমাদের পিশে না ফেলতে পারে!' *(আন-নামল, ২৭/১৮)*।

উদ্ভিদের পুরুষ এবং স্ত্রীলিঙ্গ আছে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ 'আর তিনিই এ যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড় ও নদী সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সব রকম ফল জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন। নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(আর-রা'দ, ১৩/৩)*।

গম শীষের ভেতরে রেখে দিলে তা সাধারণ তাপমাত্রায়ও কয়েক বছর পর্যন্ত ভালো থাকে এবং তা সংরক্ষণ করার জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয় না। এটি সূরা ইউসূফের ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

উঁচু ভূমিতে ফুল ও ফলের বাগান ভালো ফসল দেয়, কারণ উঁচু জমিতে পানি জমে থাকতে পারে না এবং পানির খোঁজে

গাছের মূল অনেক গভীর পর্যন্ত যায়, যার কারণে মূল বেশি করে মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে। তবে শস্য যেমন আলু, গম ইত্যাদি ফসলের জন্য উল্টোটা ভালো, কারণ তাদের ছোট মূল থাকে, যা মাটির উপরের স্তর থেকে পুষ্টি নেয়। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ‘আর যারা পূর্ণ একাগ্রতা ও অবিচলতার সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাদের এই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কোনো উঁচু ভূমিতে একটি বাগান, প্রবল বৃষ্টিপাত হলে সেখানে দ্বিগুণ ফলন হয়। আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলে সামান্য হালকা বৃষ্টিপাতই তার জন্য যথেষ্ট। আর তোমরা যা কিছু করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক দ্রষ্টা’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৫)*।

গাছে সবুজ ক্লোরোফিল রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ‘আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার মাধ্যমে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। এরপর তা থেকে সবুজ-শ্যামল ক্ষেত ও বৃক্ষ সৃষ্টি করি, তারপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি আর খেজুর গাছের মাথি থেকে খেজুরের অবনমিত কাঁদি, আঙুর বাগান, যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করি, এগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। তোমরা লক্ষ করো এর ফলের দিকে, যখন তা ফলবান হয় এবং দেখো তার পরিপক্কতা। নিশ্চয়ই এসব জিনিসের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে’ *(আল-আনআম, ৬/৯৯)*।

রাত হচ্ছে বিশ্রামের জন্য আর দিন হচ্ছে কাজের জন্য। কারণ দিনের বেলা সূর্যের আলো আমাদের রক্ত চলাচল, রক্তে সুগার, কোষে অক্সিজেনের পরিমাণ, পেশিতে শক্তি, মানসিক ভারসাম্য, মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ‘তাঁর অন্যতম অনুগ্রহ হলো, তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, যাতে তোমরা (রাতে) শান্তি এবং (দিনে) তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা শোকরগুজার হতে পারো’ *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৭৩)*।

(৯) চিকিৎসা বিজ্ঞান : মানবশিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ হয় পুরুষের বীর্য থেকে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى - مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ ‘আর তিনি পুরুষ ও নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন শুক্র থেকে, যখন তা স্খলিত হয়’ *(আন-নাজম, ৫৩/৪৫-৪৬)*। তিনি আরো বলেন, ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ ‘সে কি সবেগে স্খলিত বীর্য ছিল না? *(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/৩৭)*।

মায়ের গর্ভ শিশুর জন্য একটি সুরক্ষিত জায়গা। এটি বাইরের আলো, শব্দ, আঘাত, ঝাঁকুনি থেকে রক্ষা করে। এটি শিশুর জন্য সঠিক তাপমাত্রা তৈরি করে, পানি ও অক্সিজেন সরবরাহ করে।

মায়ের গর্ভে সন্তান কীভাবে ধাপে ধাপে বড় হয় তার নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা কুরআনের আগে অন্য কোনো চিকিৎসাশাস্ত্রে ছিল না। আল্লাহর বাণী, ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে শুক্রকীট হিসেবে রাখি। এরপর সেই শুক্রাণুকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ডে অস্থি-পাঞ্জর স্থাপন করেছি, তারপর অস্থি-পাঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে, তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টিরূপে। কাজেই সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত বরকতময় *(আল-মুমিনূন, ২৩/১৩-১৪)*।

মানবশিশু প্রথমে শুনতে পায়, তারপর দেখতে পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ আমি মানুষকে এক সংমিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি। অতঃপর আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি’ *(আদ-দাহর, ৭৬/২)*। অর্থাৎ প্রথমে কান হয়, তারপর চোখ সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষের আঙুলের ছাপ ভিন্ন। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ ‘হ্যাঁ, আমি তার আঙুলের অগ্রভাগসমূহও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম’ *(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/৪)*।

মহান আল্লাহ ওই আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন, মানুষের আঙুলের অগ্রভাগে তিনি সূক্ষ্ম কোনো রহস্য রেখেছেন, যা তিনি মানুষের পুনরুত্থানের সময়ও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

উপসংহার : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ‘নিশ্চয়ই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি আর দিন-রাতের আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে’ *(আলে ইমরান, ৩/১৯০)*।

কুরআনের ভাষা কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধের ভাষা নয়, এটি কোনো বৈজ্ঞানিক রিসার্চ পেপার নয়। মানুষ যেভাবে দেখে, শুনে, অনুভব করে, আল্লাহ কুরআনে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ কুরআনে এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেগুলো ১৪০০ বছর আগে বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনোই ধারণা নেই এমন মানুষরাও বুঝতে পারবে এবং একই সাথে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরাও সেই শব্দগুলোকে ভুল বা অনুপযুক্ত বলে দাবি করতে পারবে না।

রামাযানের শেষ দশকের আমল ও লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত

-মাহবুবুর রহমান মাদানী*

একজন মুমিন সারা বছর অপেক্ষা করেন কবে রামাযান আসবে। কারণ এই মাসেই যে আছে লায়লাতুল ক্বদর, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। তাই এই রাতগুলো অতিবাহিত করতে হবে আমল করার মাধ্যমে। চলুন জেনে নিই এই মহিমান্বিত রাতের কিছু আমল—

রামাযানের শেষ দশকের আমলসমূহ:

(১) শেষ দশকে নিজে রাত জেগে ইবাদত করা এবং পরিবার-পরিজনকেও জাগানো: আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ ‘আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (ইবাদতের জন্য রামাযানের) শেষ দশকে ইবাদতে যতটা প্রয়াসী হতেন, তা অন্য কোনো সময়ে হতেন না’।[১] আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ‘রামাযানের শেষ দশক প্রবেশ করলে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবাদতের জন্য কোমরবন্ধ শক্ত করে বেঁধে নিতেন (কঠোর পরিশ্রম করতেন), রাত্রি জাগরণ করতেন এবং পরিবার-পরিজনকেও জাগাতেন’।[২]

(২) ই‘তিকাফ করা: ই‘তিকাফের আভিধানিক অর্থ— কোনো জিনিসের সাথে লেগে থাকা, নিজেকে সেজন্য আবদ্ধ করা, সেই কাজ ভালো হোক অথবা মন্দ হোক।[৩]

শারঈ অর্থ— ‘কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মসজিদে অবধারিতভাবে অবস্থান করাকে ই‘তিকাফ বলে’।[৪]

ই‘তিকাফে বসার সময়: ২০ রামাযানের মাগরিবের আগে ই‘তিকাফের জন্য মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। ই‘তিকাফ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ‘আর তোমরা মসজিদে ই‘তিকাফরত অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করো না’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*।

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ‘রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযানের শেষ ১০ দিন ই‘তিকাফ করতেন, যে পর্যন্ত না তিনি এই পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করেন। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণীগণ ই‘তিকাফ করতেন’।[৫]

তবে কোনো নারী ই‘তিকাফ করতে চাইলে স্বামীর অনুমতি লাগবে। ই‘তিকাফ অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন, আলিঙ্গন করা অবৈধ। তবে দেখাসাক্ষাৎ করা ও কথাবার্তা বলা এবং লেনদেন জায়েয। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ই‘তিকাফ অবস্থায় আমার দিকে মাথা নুইয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিতাম। অথচ সেসময় আমি মাসিক স্রাবগ্রস্ত অবস্থায় থাকতাম। তিনি মানবীয় প্রয়োজন (পেশাব-পায়খানা) পূরণ করার উদ্দেশ্য ছাড়া বাড়িতে আসতেন না।[৬]

(৩) বিশেষভাবে লায়লাতুল ক্বদরের রাতগুলো জেগে ইবাদত করা: আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ‘রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে ক্বদর রাতের অনুসন্ধান করো’।[৭] আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘যে ব্যক্তি ক্বদরের রাতে ঈমানসহ এবং ছওয়াবের আশায় ক্বিয়াম করে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়’।[৮]

লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত সম্পর্কে মহান আল্লাহ ক্বদর নামে একটি সূরা নাযিল করেছেন: ক্বদর শব্দের অর্থ মর্যাদা, সম্মান, নির্ধারণ, অনুমান এবং আদেশ ও ফয়সালা। আর লায়ল শব্দের অর্থ রাত। এ বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ রাতে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন লাওহে মাহফূয হতে দুনিয়ার আসমানে একসাথে অবতীর্ণ করেন। সেখান থেকে প্রয়োজন

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ১৫ নং পৃষ্ঠায়)

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭৫।
২. ছহীহ বুখারী, হা/২০২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭৪।
৩. ফিক্বহুল মুয়াসসার, ১৪৫।
৪. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ২/১৩৪।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/২০২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/২০৩৮।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৭।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০১।

জবাব ও ইসলামপন্থা

-মুস্তফা মনজুর*

[১]

আমাদের দেশে ইসলামবিরোধী বিভিন্ন ইস্যুতে আমরা মোটাদাগে তিন প্রকার ইসলামপন্থী দেখতে পাই।

(ক) সরাসরি বিরোধিতাকারী: এদলের লোক কথায় কিংবা সামর্থ্যানুযায়ী কাজের দ্বারা ইসলামের পক্ষে ও ইসলামবিদ্বেষীদের বিপক্ষে অবস্থান নেন। কোনো সন্দেহ নেই, এরাই আপাত দৃষ্টিতে আমাদের নাজাতপ্রাপ্ত দল।

(খ) নীরব দর্শক: নিজে ইসলাম ভালোবাসেন, কিন্তু পার্থিব বা যে-কোনো স্বার্থে কিংবা ভয়ে নিশ্চুপ থাকেন। এদের ব্যাপারে নাজাতের আশা কম। যদি আল্লাহ অপার মেহেরবাণীতে ক্ষমা করে দেন, সেটা ভিন্ন কথা।

(গ) কৌশল অবলম্বনকারী: আমাদের অনেক বড় আলেমগণই এরূপ কৌশল অবলম্বনের ফাঁদে পড়েছেন। আজকে এ দলকে নিয়েই দু-একটি কথা বলতে চাই।

[২]

আমাদের অনেকে আছেন, তারা মনে করেন, ইসলামবিদ্বেষের এ সময়ে নিজের অবস্থান ধরে রেখে ইসলামের জন্য যতটুকু করা যায়, ততই ভালো। এরা বিদ্বেষীদের (সুশীল, মিডিয়া বা ক্ষমতার) বিপক্ষে সরাসরি অবস্থান নেন না; না কথায়, না কাজে। তারা অনেকটা সিস্টেমের মধ্যে থেকে সিস্টেম চেঞ্জ করতে আগ্রহী। এটাই তাদের ইজতিহাদ।

তাদের এ ধরনের চিন্তাভাবনা ভালো। কেননা দ্বীনের স্বার্থে ইজতিহাদও প্রতিদানযোগ্য। তবে সমস্যা হলো এ ইজতিহাদ কি সঠিক? এটি কি ইসলামপন্থার সহায়ক, না-কি আখেরে ক্ষতিকর।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত, কৌশল অবলম্বনের ইজতিহাদ সম্ভবত আমাদের বাংলাদেশের ইসলামপন্থার জন্য ক্ষতিকর। কেননা প্রায় ৯০ ভাগ মুসলিমের দেশে বিদ্বেষীদের ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ করা আর ইসলামকে নির্বাসনে দেওয়া একই কথা; কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

[৩]

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কথাই বলি। বিগত বছরগুলোতে আমরা দেখেছি, একটু একটু করে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে দূর করে সেক্যুলার শিক্ষা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের তৃতীয় দলের ভাইগণ, সরাসরি বিরোধিতার শক্ত অবস্থানে না গিয়ে কম্প্রোমাইজ করে বিভিন্ন ইস্যুর সমাধান চেয়েছেন। তাতে হয়তো সাময়িক সে সমস্যার সমাধান হয়েছে; কিন্তু পরের বছর আবার নতুন আরো অনেক সমস্যার জন্ম নিয়েছে।

আবার এসব ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যার সমাধান করে তুলনামূলক অন্য গৌণ সমস্যাগুলো রয়ে গেছে। অথচ আপাত এসব গৌণ সমস্যাই ঐ সময়ে উত্থিত না হলে বা বড় সমস্যার সাথে না আসলে বিরোধিতার মুখে পড়ত। বড় একটা সমস্যার সাথে এসে, সে গৌণ সমস্যা কিন্তু পাকাপোক্তভাবে স্থান গেড়ে নেয়। অথচ আমাদের তৃতীয় দলের ভাইগণ, একটি বড় সমস্যার সমাধান করেই তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন।

তারা ভুলে যান, সেক্যুলারিজম কোনো মুসলিমপ্রধান দেশে একবারে ঢুকে না। অল্প অল্প করে আসে। সেটাই হচ্ছে এদেশে। আর আমাদের তৃতীয় ভাইগণ এটারই সহযোগী, অথচ তারা বুঝতেই পারছেন না। সেক্যুলারিজম কখনোই বলবে না, ইসলাম শিক্ষা বাদ, কিংবা ছালাত অধ্যায় বাদ দিয়ে ব্যায়াম বা অন্য কিছু দিয়ে দেন। তাদের লক্ষ্য প্রথমে ইসলামের বিশ্বাস ও বিধানের মূল উদ্দেশ্য বিকৃতিকরণ, তারপর ধীরে ধীরে অন্য কিছু ঢোকানো; তা হতে পারে, একটি অধ্যায় বা মাত্র একটি লাইন।

একসাথে পরিবর্তন আনতে চাইলে যে মুসলিম জনতার প্রতিবাদে তাদের মূল প্রকল্প সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে, তা সেক্যুলাররা ভালো করেই জানে। এমতাবস্থায় একটু একটু করে পরিবর্তনে আমাদের তৃতীয় দল নিজের অজান্তেই কিন্তু তাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[৪]

প্রিয় পাঠক, তৃতীয় দল প্রসঙ্গে এখানেই আমার আপত্তি। কৌশল অবলম্বন আমাদের দেশের জন্য নয়। এটা সে স্থানের জন্য প্রযোজ্য, যেখানে মুসলিমরা নিগৃহীত বা সংখ্যায় কম। ফলে আস্তে আস্তে জায়গা নেওয়ার স্বার্থে নানা স্থানে কম্প্রোমাইজ করে কিছু কিছু করে ইসলামের বিধান ও বিশ্বাস ঢুকানোর কাজ করা যেতে পারে।

আর আমাদের দেশে যেখানে ইসলামী বিশ্বাস, ইবাদত ও মূল্যবোধ ভালোভাবেই প্রোথিত, সেখানে কম্প্রোমাইজ করা মানে আস্তে আস্তে ইসলামকে নির্বাসনে দিয়ে অন্যকে জায়গা করে দেওয়া। ফলে তৃতীয় দলের এ ইজতিহাদ যে আদতে বুমেরাং তা বলে দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার হয় না।

[৫]

তৃতীয় দলের এরূপ ভূমিকায় ইসলামপন্থার ক্ষতি বহুবিধ। আমার মতে, দ্বিতীয় দলের চাইতেও তৃতীয় দল ইসলামপন্থার জন্য বেশি ক্ষতিকারক। হয়তো দু-একটি ব্যতিক্রম আছে, তবে মোটাদাগে তা নিফাক্বের মতোই কুফরের চাইতে বেশি ক্ষতিকর। কেননা তৃতীয় দলের কাজের ফলে—

- সাধারণ লোকজন বিভ্রান্ত হয়। তারা বিরোধিতার চাইতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কৌশল অবলম্বনকেই বেছে নেয়।
- প্রথম দলের লোকদের জন্য অন্যকে বুঝানো কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে উলামায়ে কেরামের মধ্যে ইখতিলাফ/ইফতিরাক্ব সৃষ্টি হয়।
- প্রথম দলের লোকদের মৌলবাদী বা জঙ্গি ইত্যাদি নামে চাপে রাখা হয়।
- দ্বিতীয় দলের লোকজনও প্রকৃত ইসলামের চেতনা খুঁজে পান না।

এখন আমাদের এসব তৃতীয় দলের ভাইগণ কবে তাদের এ অবস্থান বুঝতে পারবেন আর তার সংশোধন করতে পারবেন সে অপেক্ষা। আমরা দু'আ করি তারাও যেন ইসলামের জন্য কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের নেক নিয়্যতকে সঠিক পন্থায় কাজে লাগান; যে পন্থায় ইসলামবিরোধীদের উপকার হয়, সে পন্থায় নয়। এ উপলব্ধি যত শীঘ্র আসবে ততই মঙ্গল।

"রামাযানের শেষ দশকের আমল ও লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত" প্রবন্ধটির বাকী অংশ

অনুযায়ী নবী ﷺ-এর ওপর ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়। আর এ রাতেই প্রত্যেক মানুষের পূর্ণ এক বছরের বয়স, মৃত্যু, রিযিক্ব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যা পরবর্তী বছর পর্যন্ত ঘটবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আল্লাহ বলেন, ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ 'এ রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয় *(আদ-দুখান, ৪৪/৪)*।

আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ 'নিশ্চয়ই আমরা এটিকে (কুরআনকে) ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি, আপনি কি জানেন, ক্বদরের রাত কী? ক্বদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ রাতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ (জিবরীল) তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রত্যেক বিষয়ের ফয়সালা নিয়ে অবতরণ করেন। শান্তিময় সেই রাত্রি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত' *(আল-ক্বদর, ৯৭/১-৫)*।

রাসূল ﷺ বলেন, 'ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর ছহীফাসমূহ রামাযানের প্রথম তারিখে, তাওরাত ছয় তারিখে, ইঞ্জীল ১৩ রামাযান, যাবূর ১৮ রামাযান এবং কুরআন ২৪ রামাযানে অবতীর্ণ হয়েছে' *(সিলসিলা ছহীহা, হা/১৫৭৫)*। এ বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ রাতে যে দু'আটি বেশি বেশি পড়তে হয়, তা হলো— اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমাকে ভালবাসো, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও' *(তিরমিযী, হা/৩৫১৩, হাদীছ ছহীহ)*।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদের রামাযানের শেষ দশকের রাতগুলোতে ইবাদত করার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন।

সমাজসংস্কারে রাসূলুল্লাহ ﷺ

-নাজমুল হাসান সাকিব*

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মহানবী ﷺ-এর সমাজসংস্কার সম্পর্কে বলেন, ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ‘আল্লাহর রাসূলের মধ্যে আছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ’ *(আল-আহযাব, ৩৩/২১)*। নবী করীম ﷺ-কে শান্তি, মুক্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা এসেছে, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ‘আমরা আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/১০৭)*।

মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ (৫৭০-৬৩২ খ্রি.) সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি আদর্শ জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করে সর্বাধিক কৃতিত্বের আসনে আসীন হয়েছেন। যা সর্বকালের ও সর্বযুগের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মুখে মুখে স্বীকৃত। তিনি এমনি এক যুগসন্ধিকালে পৃথিবীতে এসেছেন, যখন আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। গোত্র কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি, চরম উচ্ছৃঙ্খলতা, পাপাচার, ব্যভিচার ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল গোটা সমাজ।

সামাজিক সাম্য-শৃঙ্খলা, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, নারীর মর্যাদা ইত্যাদির নাজুক অবস্থা তৈরি হয়েছিল। সূদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, চুরি-লুণ্ঠন, ব্যভিচার, পাপাচার, অন্যায়-অপরাধের তাণ্ডবলীলায় সমাজকাঠামো ধসে পড়েছিল। এমন এক ক্রান্তিলগ্নে মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি আরবের বুকে এক বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করে বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে নবুঅতের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। নবী ﷺ-এর আগমন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্ব মানবতার জন্য বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ‘অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষা দান করেন’ *(আলে ইমরান, ৩/১৬৪)*।

মহানবী ﷺ সমাজের যাবতীয় অনাচার দূর করে যে এক জান্নাতী সমাজব্যবস্থা ক্বায়েম করেন, ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। নিম্নে তাঁর সংস্কারের কিছু নমুনা পেশ করা হলো।

তাওহীদের আদর্শে সমাজের গোড়া পত্তন: ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানা অনাচার, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে নবী ﷺ সমগ্র সমাজকে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী তাওহীদের আদর্শে নবরূপে রূপায়িত করেন। সকল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উৎস একমাত্র আল্লাহকেই মেনে নিয়ে সমাজের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না’ *(আন-নিসা, ৪/৩৬)*।

মানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠন: সমগ্র আরব দেশ জঘন্য পাপ ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ সাম্য, অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্ব মানবতার ভিত্তিতে যে এক উন্নত ও আদর্শ সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোনো নজির নেই। তাঁর প্রবর্তিত সমাজে গোত্রের বা রক্তের সম্পর্কের চেয়ে ঈমানের বন্ধনই ছিল মযবূত ঐক্যের প্রতীক। তিনি অন্ধ আভিজাত্যের গৌরব ও বংশ মর্যাদার গর্বের মূলে কুঠারাঘাত হানেন এবং সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ কাঠামো প্রস্তুত করেন।

মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর সবচেয়ে বেশি অনুগত ও মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী। তাঁর সমাজ ব্যবস্থায় উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, কালো-সাদার কোনো বৈষম্য রইল না। মানুষে মানুষে সকল প্রকার অসাম্য ও ভেদাভেদ দূরীভূত করে মানবতার অত্যুজ্জ্বল আদর্শে সমাজবন্ধন সুদৃঢ় করেন। আরবের ইতিহাসে রক্তের পরিবর্তে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের এটাই প্রথম দৃষ্টান্ত। হাদীছে এসেছে, ‘প্রত্যেক মানুষ আদম ও হাওয়ার সন্তান। অনারবের ওপর আরবের আর আরবের ওপর অনারবের, কালোর ওপর সাদার কিংবা সাদার ওপর কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শুধু তাক্বওয়া ও নেক আমল ছাড়া’।[১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের জাহেলী যুগের অহংকার-গৌরব ও পূর্ব বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিয়েছেন’।[২]

* দাওরায়ে হাদীছ (মাস্টার্স), ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা; অধ্যয়নরত (ইফতা), আল-মারকাজুল ইসলামী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

১. ইমাম বাইহাকী, শু‘আবুল ঈমান, হাদীছ/৫১৩৭।

২. আল-বিদায়া ওয়াল নিহায়া, ৪/৩০১; ইবনে হিশাম, ২/৪১২।

দাসদের সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা দান: মনিবরা গোলামদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করত। মানুষ হিসেবে তাদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মনিবদের নির্দেশ দিলেন ক্রীতদাসদের প্রতি সদাচরণ করতে। তিনি বললেন, তোমরা যা খাও, পরিধান করো, তাদের তা খেতে এবং পরিধান করতে দাও। তিনি তাদের মুক্তির পথনির্দেশ করে ঘোষণা দিলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিন দাসকে আজাদ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আজাদকারীর প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। এমনকি তার (দাসের) লজ্জাস্থানের বিনিময়ে মুক্তকারীর লজ্জাস্থানকে মুক্তি দিবেন'।[৩] তিনি নিজেও অনেক দাসকে মুক্ত করেন। এতে অনেক ছাহাবী তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁর উদারতার জন্য দাস বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন এবং ক্রীতদাস যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করে দাসদের পূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

নারীর মর্যাদা দান: তৎকালীন আরবে নারীদের ভোগ্যসামগ্রী মনে করা হতো। তারা ছিল পুরুষদের দাসী মাত্র। এমনকি কন্যাসন্তানের জন্মকে অপমানের বিষয় মনে করা হতো। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ 'আর যখন তাদেরকে কন্যাসন্তানের সংবাদ দেওয়া হতো, তখন তাদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যেত' *(আন-নহল, ১৬/৫৮)*। তাই কন্যা সন্তানদের জীবন্ত দাফন প্রথা প্রসিদ্ধ ছিল।

পরিবারের কর্তা ইচ্ছা করলে নারীকে ক্রয়-বিক্রয় এবং হস্তান্তর করতে পারত। পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের কোনো অংশ ছিল না। মহানবী ﷺ এই কুসংস্কার ও জঘন্য প্রথা বন্ধ করেন এবং নারী সমাজের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা দূর করতে তিনি ঘোষণা করেন, 'মেয়ের ব্যাপারে কোনো কিছু দিয়ে যাকে পরীক্ষা করা হয়, সে যদি তাতে ধৈর্যধারণ করে, তবে তারাই তার জন্য জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে'।[৪] অন্য হাদীছে আছে, 'যে ব্যক্তি দুটি মেয়ে সন্তান লালনপালন করবে, সে আর আমি এমনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করব'। এই বলে তিনি দুই আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখান।[৫]

নারীসমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর আবশ্যক করেছেন, দিয়েছেন সমাজে নারীদের পরিপূর্ণ মর্যাদা। হাদীছে এসেছে, মুআবিয়া ইবনু জাহেমা সুলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন নিবাসের জন্য আপনার সাথে থেকে জিহাদ করার মনস্থির করেছি। একথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা বেঁচে আছেন কি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি তার পায়ের কাছে লেগে থাকো। কেননা সেখানেই জান্নাত রয়েছে'।[৬]

নবী করীম ﷺ সমাজে নারীদের অভূতপূর্ব মর্যাদা দেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম'।[৭] তিনি সর্বপ্রথম নারীদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা দেন। নবী করীম ﷺ বলেন, 'তোমরা নারী জাতির (অধিকারের) ব্যাপারে সতর্ক হও। কেননা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ'।[৮] এসবের জন্য নারী জাতি সমাজের অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদে পরিণত হয়।

সংঘাতমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা: তৎকালীন আরবের বিভিন্ন গোত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকত। সামান্য অজুহাতে ভয়াবহ যুদ্ধের দামামা বেজে যেত। তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত দাবানলের মতো জ্বলতে থাকত। রক্তপাত ও লুণ্ঠন ছিল তাদের নিত্যদিনের পেশা। মুহাম্মাদ ﷺ এসব অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রাক-নবুঅতে 'হিলফুল ফুযূল' এবং পরে 'মদীনা সনদ'-এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি আনয়ন করেন।

মদ্যপান রহিতকরণ: মদ্যপ্রিয়তা আরবদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। মদপান করে নর্তকীদের সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে তারা যেকোনো অশ্লীল কাজ করত। মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ দেখলেন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে চরম ক্ষতি সাধনকারী। তাই তিনি কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সমাজের কল্যাণ সাধন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী, ভাগ্য নির্ধারক শর নাপাক ও শয়তানী কর্ম। কাজেই তোমারা এসব থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো' *(আল-মায়িদা, ৫/৯০)*।

জুয়া খেলা নিষিদ্ধ: আরবে তখন জুয়া খেলার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং এটাকে তারা সম্মানজনক অভ্যাস মনে করত। জুয়া খেলায় হেরে মানুষ অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতো। ফলে ব্যাহত হতো সামাজিক জীবন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুয়া খেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সমাজকে ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন।

---

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১৫০৯; তিরমিযী, হা/১৫৪১; ইরওয়াউল গলীল, হা/১৭৪২।
৪. তিরমিযী, হা/১৯১৯।
৫. তিরমিযী, হা/১৯২০।
৬. ইবনু মাজাহ, হা/২৭৮১, হাদীছ ছহীহ।
৭. তিরমিযী, হা/৩৮৯৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৯৭৭।
৮. আবূ দাঊদ, হা/১৯০৫।

কুসীদপ্রথা উচ্ছেদ: কুসীদপ্রথা হলো একপ্রকার সূদের কারবার। আরব সমাজে জঘন্য কুসীদপ্রথা বিদ্যমান ছিল। আরবে প্রচলিত এই ব্যবস্থা সুস্থ সমাজ বিকাশে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ ছিল। নবী করীম ﷺ সূদ হারাম ঘোষণা করেন এবং আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীকে 'ক্বরযে হাসানা' দানে উৎসাহ প্রদান করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ 'কে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তাহলে তিনি তাকে তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২৪৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ 'নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম কর্য দেয়, তাদেরকে তিনি বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান' *(আল-হাদীদ, ৫৭/১৮)*।

কুসংস্কার হতে মুক্তি: আরবের জাহেলী সমাজে নানা কুসংস্কার ছিল। ভাগ্য নির্ধারক তির, দেবদেবীর সাথে অলীক পরামর্শ, মৃতের অজ্ঞাতযাত্রার ধারণা প্রভৃতি চালু ছিল। শুধু তাই না, আরও নানা প্রকার ভূত-প্রেত, দৈত্য প্রভৃতিকে তারা বিশ্বাস করত। নবী করীম ﷺ বিভিন্নভাবে তাদের মন ও মগজ থেকে সমস্ত কুসংস্কার দূর করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী, ভাগ্য নির্ধারক শর নাপাক ও শয়তানী কর্ম। কাজেই তোমারা এসব থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। নিশ্চয়ই শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না? আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া' *(আল-মায়েদা, ৫/৯০-৯২)*।

নিষ্ঠুরতার অবসান: প্রাচীন আরব নিষ্ঠুরতায় ভরপুর ছিল। ভোগবাদী আরবরা দাস-দাসী, এমনকি শত্রু গোত্রের লোকদের সাথে অমানবিক আচরণ করত। মহানবী ﷺ সমাজ হতে এরূপ বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা দূর করে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করেন।

যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন: অর্থনৈতিক দৈন্যদশা বিদূরিত করে সমাজের সার্বিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সৌধ নির্মাণের নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতের বিধান প্রবর্তন করেন। যাতে করে সমাজ হতে দারিদ্র্য বিমোচনের পথ সুগম হয়। তিনি ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য সমাজ হতে চিরতরে উৎখাত করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ 'তোমরা ছালাত ক্বায়েম করো এবং যাকাত দাও। তোমরা যা কিছু উত্তম আমল নিজেদের জন্য অগ্রীম প্রেরণ করবে, আল্লাহর নিকট তা পাবে' *(আল-বাক্বারা, ২/১১০)*।

আর্থ-সামাজিক অসাধুতা দূরীকরণ: মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ আর্থ-সামাজিক অসাধুতা, প্রতারণা, মিথ্যাচার, দুর্নীতি, হঠকারিতা, মজুদদারি, কালোবাজারি ইত্যাকার যাবতীয় অনাচার হারাম ঘোষণা করেন এবং তা সমাজ থেকে উচ্ছেদ করে একটি সুন্দর, পবিত্র সমাজ কাঠামো বিনির্মাণ করেন।[৯] নবী ﷺ বলেছেন, 'একমাত্র পাপী ব্যক্তিরাই মজুদদারি করে থাকে'।[১০]

জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা: রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করেন। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং কারো সম্পদ গ্রাস করা যাবে না। সকলের জীবন ও সম্পদ পবিত্র- এ বিশ্বাসের ওপর সমাজ কাঠামোকে গড়ে তোলেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তারা তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করে। শীঘ্রই তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে' *(আন-নিসা, ৪/১০)*। বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী ﷺ বলেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, সম্ভ্রম পবিত্র; যেমন পবিত্র আজকের এই দিন, এই মাস ও এই নগরী'।[১১]

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: বিভিন্ন প্রকার অবিচার, অনাচার দূরীকরণের জন্য নবী ﷺ আইনের শাসন ক্বায়েম করেন। আইনকে ব্যক্তি বিশেষ অথবা কোনো গোত্রের হাতে না দিয়ে কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগের হাতে ন্যস্ত করেন। যেন আইন কারো ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার না হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ অতি অল্প সময়ে স্বীয় প্রচেষ্টা, অদম্য শক্তিবলে সকল অনাচারের মূলোৎপাটন করে অসভ্য, দ্বিধাবিভক্ত, সদা কলহপ্রিয় সে সময়ের সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত আরবকে সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের বন্ধনে সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এভাবে তিনি পুরো বিশ্বের জন্য সর্বোত্তম সমাজসংস্কারক হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেজন্য বলতে হয়, মুহাম্মাদ ﷺ সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব ও আখেরী নবী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর অনুসরণ করবে অবশ্যই তারা হেদায়াত পাবে। ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ করবে।

---

৯. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/২৩৯৮।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/১৬২২-১৬২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮।

ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

-মো. দেলোয়ার হোসেন*

ছালাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ইসলামে এর রয়েছে মহান মর্যাদা ও বিশাল গুরুত্ব। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ছালাতের গুরুত্ব, ফযীলত ও ছালাত পরিত্যাগের ভয়াবহতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

(ক) ছালাতের গুরুত্ব :

(১) ছালাত ইসলামের ২য় রুকন : কালেমা শাহাদাতের পরেই ছালাতের স্থান। সুতরাং ইসলামে ছালাতের গুরুত্ব কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه رَسُوْلُه وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ‘পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল, **ছালাত ক্বায়েম করা,** যাকাত আদায় করা, হজ্জ পালন করা আর রামাযান মাসের ছিয়াম রাখা’।[১]

(২) আল্লাহ তাআলা ছালাতকে মে‘রাজরে রজনিতে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর ফরয করেছেন : এটা ছালাতের গুরুত্ব বহন করে। কারণ অপরাপর সকল ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যখন নির্দেশনা নাযিল করেছেন, তখন নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়াতেই অবস্থান করেছিলেন। শুধু ছালাতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

(৩) ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِه صَلَاتُه فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ‘ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো তার ছালাত। যদি তার ছালাত সঠিক হয়, তাহলে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি ছালাত বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে’।[২]

(৪) ছালাত নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সর্বশেষ অছিয়ত : মৃত্যুকালে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সর্বশেষ অছিয়ত ছিল ছালাত। হাদীছে এসেছে, আলী ইবনু আবী তালেব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শেষ কথা ছিল, الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‘তোমরা ছালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীর প্রতি যত্নবান হবে’।[৩]

(৫) ছালাতকে আল্লাহ কুরআনে ঈমান বলে আখ্যায়িত করেছেন : ছালাত কত গুরুত্বপূর্ণ তা এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, যেখানে আল্লাহ ছালাতকে ঈমান বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ ‘আর আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের (বায়তুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে আদায়কৃত পূর্বের) ঈমান (ছালাতকে) বরবাদ করবেন না’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৪৩)*।

(৬) সাত বছর থেকে ছালাতের আদেশ দিতে হবে : ছালাত একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, সাত বছর থেকেই পিতা-মাতা সন্তানকে ছালাতের আদেশ দিবেন। আমর ইবনু শুআইব (রাহিমাহুল্লাহ) তার পিতার মাধ্যমে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ‘তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাত আদায়ের জন্য আদেশ করো, যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর তোমরা তাদেরকে ছালাত আদায়ের জন্য প্রহার করো, যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় এবং তাদের ঘুমানোর স্থান পৃথক করে দাও’।[৪]

(খ) ছালাতের ফযীলত :

(১) ছালাত জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম : ছালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন জান্নাত লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ-أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ﴾ ‘আর যারা তাদের ছালাতের হেফাযত করে, তারা সম্মানিত হবে জান্নাতে’ *(আল-মা‘আরিজ, ৭০/৩৪-৩৬)*। আবূ উমামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ‘তোমাদের ওপর ফরযকৃত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করো, তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা (রামাযান) মাসের ছিয়াম পালন করো, তোমাদের ধনসম্পদের যাকাত আদায় করো এবং তোমাদের শাসকের আনুগত্য করো, এভাবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করো’।[৫]

(২) ছালাত পাপ মোচনের অন্যতম মাধ্যম : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوْا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا ‘তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সামনে

---

* অধ্যয়নরত, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬; মিশকাত, হা/৪।

২. তিরমিযী, হা/৪১৩, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/১৩৩০।

৩. ইবনু মাজাহ, হা/২৬৯৮, হাদীছ ছহীহ; আবূ দাঊদ, হা/৫১৫৬।

৪. আবূ দাঊদ, হা/৪৯৫, হাসান; মিশকাত, হা/৫৭২।

৫. তিরমিযী, হা/৬১৬, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৫৭১।

একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? ছাহাবীগণ বললেন, না কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বললেন, 'এটা হলো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উদাহরণ, এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেন'।[৬] অন্য হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুম্বন দিয়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি (অনুতপ্ত হয়ে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ঘটনাটি বলেন। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ 'তুমি ছালাত প্রতিষ্ঠা করো দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয় পুণ্য কর্মাদি পাপরাশিকে বিদূরিত করে থাকে' *(হূদ, ১১/১১৪)*। লোকটি বললেন, এ বিধান কি কেবল আমার জন্য? তিনি বললেন, 'আমার উম্মতের সকলের জন্য'।[৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যেসব পাপ সংঘটিত হয়, সেসবের মোচনকারী হয় (এই শর্তে) যদি সে কাবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়'।[৮] হাদীছে আরও এসেছে, আবূ উছমান রহিমাহুল্লাহ বলেন, একদা একটি গাছের নিচে আমি সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হেলিয়ে দিলেন। এতে ডালের সমস্ত পাতাগুলো ঝরে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবূ উছমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে নাকি যে, কেন আমি এরূপ করলাম? আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি বললেন, একদা আমিও আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরূপ করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হেলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, 'হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে নাকি যে, কেন আমি এরূপ করলাম? আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, 'মুসলিম যখন সুন্দরভাবে ওযূ করে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝরে যায় যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল'।[৯] আর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّآتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ﴾ 'আর তুমি দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের কিছু অংশে ছালাত ক্বায়েম করো। অবশ্যই পুণ্যরাশি পাপরাশিকে দূরীভূত করে দেয়। এটা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ' *(হূদ, ১৩/১১৪)*।

(৩) পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায়কারী ৫০ ওয়াক্ত ছালাতের ছওয়াব লাভ করে : আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ 'মে'রাজের রাতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ৫০ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। অতঃপর ঘোষণা করা হলো, হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই আমার নিকট কথার কোনো রদবদল করা হয় না। আপনার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের বদৌলতে ৫০ ওয়াক্তের ছওয়াব রয়েছে'।[১০]

(৪) ছালাত পাপ থেকে দূরে রাখে : ছালাত বান্দাকে পাপ থেকে দূরে রাখে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ 'নিশ্চয় ছালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এক লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন এবং তাঁকে বললেন, অমুক লোক রাত্রে ছালাত আদায় করে কিন্তু ভোরে উঠে চুরি করে। তিনি বললেন, 'তুমি যে আমলের কথা বলছো, তা তাকে অচিরেই বাধা দিবে'।[১১]

(৫) ছালাত আদায়কারী হাশরের মাঠে ছিদ্দীক্ব ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে : হাদীছে এসেছে, আমর ইবনু মুররাহ আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি আমি এ সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মা'বূদ নেই, আপনি আল্লাহর রাসূল; পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, যাকাত দেই, রামাযানের ছিয়াম রাখি, রাত্রিতে তারাবীহ পড়ি? তিনি (রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ 'যে ব্যক্তি এমন আমলের উপর মারা যাবে, সে ছিদ্দীক্ব ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে'।[১২]

(৬) ছালাত হচ্ছে নূর : ছালাত হলো নূর। যে নূর দিয়ে মুমিন ব্যক্তি হাশরের মাঠের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাবে। আবূ মালেক আল আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক। 'আল-হামদুলিল্লাহ' মানুষের আমলের পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দিবে এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ' আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মাঝে ছওয়াবে পরিপূর্ণ করে দেয়, ছালাত হলো নূর বা আলো। দান-খয়রাত হলো

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬৭; মিশকাত, হা/৫৬৫।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৬৩; মিশকাত, হা/৫৬৬।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৩; মিশকাত, হা/৫৬৪।
৯. আহমাদ, হা/২১৫৯৬, হাসান; মিশকাত, হা/৫৭৬।
১০. তিরমিযী, হা/২১৩, হাদীছ ছহীহ।
১১. আহমাদ, হা/৯৭৭৭, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/১২৩৭।
১২. ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/২২১২; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩৪৩৮।

(দানকারীর পক্ষে) দলীল। ছবর বা ধৈর্য হলো জ্যোতি। কুরআন হলো তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক মানুষ ভোরে ঘুম হতে উঠে নিজের আত্মাকে বিক্রয় করে; হয় তাকে সে আজাদ করে অথবা ধ্বংস করে'।[১৩] অন্য হাদীছে এসেছে, বুরায়দা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামতের দিনের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দিন তাদেরকে, যারা অন্ধকারে মসজিদে হেঁটে যায়'।[১৪]

(গ) ছালাত পরিত্যাগের ভয়াবহতা :

(১) ছালাত পরিত্যাগ করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَتَسَاءَلُونَ-عَنِ الْمُجْرِمِينَ-مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ- قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ 'তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, তোমাদেরকে কীসে জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? তারা বলবে, আমরা ছালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না' *(মুদ্দাচ্ছির, ৭৪/৪০-৪৩)*। আল্লাহ আরো বলেন, ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ-الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ-الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ 'কাজেই দুর্ভোগ সে ছালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে' *(আল-মাঊন, ১০৭/৪-৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ 'তাদের পরে আসলো এমন এক প্রজন্ম, যারা ছালাত বিনষ্ট করেছিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে' *(মারইয়াম, ১৯/৫৯)*।

(২) ছালাত পরিত্যাগকারীর হাশরের মাঠের ভয়াবহতা : আল্লাহ বলেন, ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ 'সেদিন আল্লাহ তার পায়ের গোছা উন্মুক্ত করে দিবেন এবং তাদেরকে সিজদা করার আহ্বান জানানো হবে কিন্তু তারা সিজদা দিতে সক্ষম হবে না' *(আল-ক্বলম, ৬৮/৪২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ 'যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার জীবন হবে সংকীর্ণ এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব' *(ত্বোয়া-হা, ২০/১২৪)*।

(৩) ছালাত পরিত্যাগকারী মুমিনদের বন্ধু নয় : ছালাত পরিত্যগকারী মুসলিমদের ভাই হতে পারে না। আল্লাহ বলেন, ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ 'অতঃপর তারা যদি তওবা করে, ছালাত পড়ে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই' *(আত-তওবা, ৯/১১)*।

(৪) ছালাত পরিত্যাগকারীর উপর থেকে আল্লাহর যিম্মা উঠে যায় : ছালাত পরিত্যাগকারীর উপর থেকে আল্লাহর যিম্মা উঠে যায়। মুআয (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ১০টি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও কোনো ফরয ছালাত ছেড়ে দিয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগ করে, তার থেকে আল্লাহর যিম্মা উঠে যায়।[১৫]

(৫) ছালাত পরিত্যাগকারীদের ক্বারূন, ফিরআউন, হামান ও উবাই ইবনু খালাফ-এর সাথে হাশর হবে : আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন ছালাত সম্পর্কে আলোচনায় বললেন, مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ 'যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করবে, তা ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করবে না, তার জন্য এটা জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে না। ক্বিয়ামতের দিন সে ক্বারূন, ফিরআউন, হামান ও উবাই ইবনু খালাফ-এর সাথে থাকবে'।[১৬]

(ঘ) ছালাত পরিত্যাগকারীর হুকুম :

যারা ছালাত আদায় করে না, তাদের ব্যাপারে ইসলামে ভয়াবহ বক্তব্য এসেছে। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ '(মুমিন) বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো ছালাত পরিত্যাগ করা'।[১৭] বুরায়দা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ 'আমাদের ও তাদের (মুনাফেক্বদের) মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা হলো ছালাত। অতএব, যে ছালাত পরিত্যাগ করল, সে কুফরী করল'।[১৮] আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবীগণ ছালাত ছাড়া অন্য কোনো আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে মনে করতেন না'।[১৯]

পরিশেষে বলব, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার তাওফীক্ব দান করেন এবং সাথে সাথে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে নেন- আমীন।

---

১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩; মিশকাত, হা/২৮১।
১৪. আবূ দাঊদ, হা/৫৬১; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারগীব, হা/৩১৫, ৪২৫।
১৫. আহমাদ, হা/২১৫৭০, হাসান; মিশকাত, হা/৬১।
১৬. আহমাদ, হা/৬৫৭৬, হাসান; মিশকাত, হা/৫৭৮।
১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৮২; তিরমিযী, হা/২৬২০; আবূ দাঊদ, হা/৪৬৭৮; ইবনু মাজাহ, হা/১০৭৮; নাসাঈ, হা/৪৬৪; মিশকাত, হা/৫৬৯।
১৮. তিরমিযী, হা/২৬২১, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/১০৭৯; নাসাঈ, হা/৪৬৩; মিশকাত, হা/৫৭৪।
১৯. তিরমিযী, হা/২৬২২, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৫৭৯।

www.al-itisam.com

চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ছিয়াম

-মো. কায়ছার আলী*

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারো’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*। একই সূরায় ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, পবিত্র রামাযান মাসেই আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে। শুধু পবিত্র আল-কুরআনই নয়; এই রামাযান মাসেই অন্যান্য আসমানী কিতাব ও ছহীফা নাযিল করা হয়েছে। রামাযান মাসের প্রথম রাত্রে নাযিল হয়েছে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর প্রতি তাঁর ছহীফা। দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর প্রতি যাবূর কিতাব নাযিল হয় এ মাসের ১২ তারিখে। মূসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল হয় এ মাসের ৬ তারিখে এবং ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ইঞ্জীল কিতাব নাযিল হয় ১৮ রামাযান। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আল-কুরআন নাযিল হয় ২৪ রামাযান।[১] আল-কুরআনের উপরের আয়াতের সূত্র জানিয়ে দেয়, ছওম বা ছিয়াম পালনের ইতিহাস দীর্ঘ।

ছিয়ামের আসল উদ্দেশ্য তাক্বওয়া অর্জন। একই সাথে আমাদের শরীর ও মনের জন্য এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। ছিয়াম রাখার কারণে উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা কমে আসে। নির্দিষ্ট সময়ে ছিয়াম রাখার কারণে আমাদের শরীরের চর্বি Burn হয়। কিন্তু এই উপবাস যদি দীর্ঘসময় ধরে করা হয়, তাহলে মাংসপেশির শর্করা ভেঙে যায় যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাহরী খেতে এবং ইফতার দেরি না করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। নিয়মিত ছিয়াম রাখলে হৃদরোগের ঝুঁকি ৫৮% কমে যায়। ছিয়াম রাখার কারণে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল LDL (কমিয়ে সুগারের Metabolism এর উন্নতি হয়। এটা ওজন বৃদ্ধি পাওয়া এবং ডায়াবেটিস এর ঝুঁকি কমায় অর্থাৎ হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। ছিয়াম রাখলে ৩০-৪০% ভালো কলেস্টেরল HDL (বৃদ্ধি পায় এবং TG (ট্রাইগ্লিসারাইড নামক এক ধরণের চর্বি অণু, যা শরীরে অধিক মাত্রায় থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়) ও শরীরের ওজন কমায়। এক কথায় বলা যায় ছিয়াম হচ্ছে হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর ঔষধবিহীন অন্যতম একটি মাধ্যম।

ইসলামের প্রথম যুগে ছিয়ামের নিয়ম ছিল এশার পর ঘুমিয়ে পরলে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার এবং কামাচার হারাম হয়ে যেত। ইসলামী শরীআতে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত সময় পর্যন্ত কিছু খাওয়া বা পান করা এবং যৌন তৃপ্তিকর কোনো কিছু করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত যে-কোনো আহার বিহারে সংযম সাধনা নষ্ট হয় না। ছিয়াম পালনকারীর জন্য মিথ্যা, পরনিন্দা, পরের অকল্যাণ চিন্তা ও মন্দকর্ম শুধু নিষিদ্ধই নয়; অনৈতিকভাবেও এর চর্চা বা পরিচর্চা করলে প্রকৃত ছিয়াম হবে না। বর্তমানে এক মাস ছিয়ামের পরও যদি কেউ সাওয়ালের ছিয়াম, মুহাররমের ছিয়াম, আরাফাতের দিনে ছিয়াম, সপ্তাহে দুই দিন বা মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখেন তাহলে তাঁদের স্বাস্থ্যের উপকারিতা অন্যদের চেয়ে বেশি হবে যা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। রামাযান মাসে ছিয়াম সাধনার পর তারাবীহর ছালাতসহ অন্যান্য ইবাদত বিশেষ করে যাকাত (সচ্ছল ব্যক্তিদের) ও ফেত্বরা প্রদান, লায়লাতুল ক্বদর, ই‘তিকাফ পালনের মাধ্যমে একজন মুমিন ব্যক্তি নিজেকে শুধু পরিশুদ্ধই করে না; দু‘আ কবুলের সুযোগ গ্রহণ করে আখেরাতের নাজাতের পথ খুঁজে নেয়। ছিয়ামের আসল উদ্দেশ্য মানুষের জাগতিক ও মনোদৈহিক উৎকর্ষ সাধন করে ছিয়াম পালনকারীদের মনে আধ্যাত্মিক চৈতন্য জাগ্রত করে। ছিয়াম অনুশীলনে ছিয়াম পালনকারীকে আত্মসংযম ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে ধৈর্য ও সহানুভূতির অনুভূতি জাগিয়ে তুলে। ফলে ছিয়াম রিপুগুলোকে কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করে। সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ আসমানী কিতাব আল-কুরআনে ছিয়ামের আবেদন অনেক বেশি তাৎপর্য বহন করে। মুসলিমদের জীবনে ছিয়াম শুধু উপবাস নয়; ছিয়ামে উপবাস আছে, কিন্তু উপবাসে ছিয়াম নেই। ফলে উপবাসের সাথে ছিয়ামের গুণগত তফাতটাও গৌণ নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের ছিয়াম পালন করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

* শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।

১. তাফসীরে ত্বাবারী, ২৪/৩৭৭।

সূরাতুল ক্বদর: এক মহিমান্বিত রজনির গল্প

-মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার*

সূরাতুল ক্বদর ও তার অনুবাদ: আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

‘নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি লায়লাতুল ক্বদরে। আর আপনাকে কীসে জানাবে লায়লাতুল ক্বদর কী? লায়লাতুল ক্বদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ নাযিল হন তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে। শান্তিময় সে রাত, ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/১-৫)*।

সূরাটি নাযিলের পটভূমি:

(১) মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, ঐ লোকটি এক হাজার মাস পর্যন্ত আল্লাহর পথে অস্ত্র ধারণ করেছিল অর্থাৎ জিহাদে অংশ নিয়েছিল। মুসলিমরা এ কথা শুনে বিস্মিত হওয়ায় আল্লাহ তাআলা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেন যে, লায়লাতুল ক্বদরের ইবাদত ঐ ব্যক্তির এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।[১]

(২) ইবনে জারীর রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, বানী ইসরাঈলের একটি লোক সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং দিনের বেলায় সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতেন। এক হাজার মাস পর্যন্ত তিনি এইভাবে কাটিয়ে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই সূরা অবতীর্ণ করে তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতকে সুসংবাদ দেন যে, এই উম্মতের কোনো ব্যক্তি যদি লায়লাতুল ক্বদরে ইবাদত করে, তবে সে বানী ইসরাঈলের ঐ ইবাদতকারীর চেয়ে অধিক পুণ্য লাভ করবে।

(৩) আলী ইবনে উরওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানী ইসরাঈলের চারজন আবেদের কথা উল্লেখ করেন। তারা ৮০ বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য তারা আল্লাহর নাফরমানী করেননি। তাঁরা হলেন, আইয়ূব আলাইহিস সালাম, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম, হাকীল ইবনে আ‘জয় আলাইহিস সালাম এবং ইউশা‘ ইবনে নুন আলাইহিস সালাম। ছাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম এ ঘটনা শুনে খুবই অবাক হলেন। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার উম্মত এই ঘটনায় বিস্ময়বোধ করেছেন। জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা আপনার উপর এর চেয়েও উত্তম জিনিস দান করেছেন। আপনার উম্মত যে ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছে এটা তার চেয়েও উত্তম। তারপর তিনি তাঁর কাছে এই সূরাটি পাঠ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত খুশী হন।[২]

লায়লাতুল ক্বদরের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব:

লায়লাতুল ক্বদরের অনেক গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

(১) এ মহিমান্বিত রজনিতে কুরআন নাযিল হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ‘নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি লায়লাতুল ক্বদরে’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/১)*। তিনি অন্যত্রে বলেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ‘রামাযান মাস— যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের পথপ্রদর্শক এবং হেদায়াত ও সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারীর বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে ছওম পালন করে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

(২) এ রাত্রি হাজারো মাস থেকে উত্তম। অর্থাৎ লায়লাতুল ক্বদর নেই এমন হাজারো মাসে ইবাদতের চেয়ে এ এক রাত্রির ইবাদত অধিক উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ‘লায়লাতুল ক্বদর’ হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/৩)*।

রামাযান মাস আগমন করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তোমাদের নিকট রামাযান আসন্ন। মুবারক

* কুল্লিয়া ১ম বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

১. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা আল-ক্বদর।

২. প্রাগুক্ত।

মাস। আল্লাহ এর ছওম ফরয করেছেন। এতে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানদেরকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়। এতে এমন এক রাত রয়েছে, যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত্রির কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো'।[৩]

(৩) এ রাতে সকল প্রকার কল্যাণ, বরকত ও রহমতসহকারে ফেরেশতাগণ নাযিল হন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ 'সে রাতে ফেরেস্তাগণ ও রূহ (জিবরীল) নাযিল হন তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে' *(আল-ক্বদর, ৯৭/৪)*।

(৪) সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারাটা রাত শুধু শান্তি আর শান্তি তথা কল্যাণে পরিপূর্ণ। সে রাত্রি সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ শান্তিময় সে রাত, ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত' *(আল-ক্বদর, ৯৭/৫)*।

(৫) এ রাত মহা বরকতময়। আর এ বরকত সূর্যাস্তের পর হতে ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ 'নিশ্চয়ই আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনিতে' *(আদ-দুখান, ৪৪/৩)*।

(৬) এ রাতে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে ক্বদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ এ রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়' *(আদ-দুখান, ৪৪/৪)*।

(৭) যে ব্যক্তি এ রাত্রি জেগে আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ তার পূর্বকৃত সব গুনাহ মাফ করে দিবেন। রাসূল ﷺ বলেন, مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে নেকীর আশায় ক্বদরের রাতে ইবাদতের মধ্যে রাত্রি জাগবে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[৪]

লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত:

রাসূল ﷺ-এর জবানে লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

(১) আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের নিকট রামাযান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা এই মাসের ছওম ফরয করেছেন। এ মাসের আগমনে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের লোহার বেড়ি পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে, যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল, সে প্রকৃতই বঞ্চিত রয়ে গেল'।[৫]

(২) আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে নেকীর আশায় ক্বদরের রাতে ইবাদতের মধ্যে রাত্রি জাগবে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[৬]

সূরাতুল ক্বদর থেকে পথনির্দেশনা:

(১) এ সূরা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ মনোনীত একজন নবী ও রাসূল ছিলেন এবং তার কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অহী আসত।

(২) এ সূরা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব।

(৩) এ সূরা থেকে সুস্পষ্টভাবে লায়লাতুল ক্বদরের মাহাত্ম্য ও তাতে ইবাদতের অনেক ফযীলত রয়েছে, তা প্রমাণিত হয়।

(৪) এ সূরা থেকে বুঝা যায় যে, কুরআনুল কারীম একত্রে রামাযান মাসেই লাওহে মাহফূয থেকে দুনিয়ার আসমানে নাযিল হয়েছে। আর এ নাযিল হয়েছিল রামাযান মাসে।

(৫) লায়লাতুল ক্বদরে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা ও শ্রবণ করা মুস্তাহাব। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই রজনিতে বেশি বেশি আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৩. নাসাঈ, হা/২১০৬।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩৫।
৫. নাসাঈ, হা/২১০৬।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৩৫।

ঈদের মাসায়েল

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা:

‘ঈদ’ (عيد) শব্দটি আরবী, যা ‘আউদুন’ (عود) মাছদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো— উৎসব, পর্ব, ঋতু, মৌসুম,[১] প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন[২] ইত্যাদি। প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে ‘ঈদ’ বলা হয়।[৩]

২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে ‘ঈদুল ফিত্বর’-এর সূচনা হয়।[৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে, মদীনাবাসী বছরে দু’দিন খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে উক্ত দু’দিন উৎসব পালন করতে নিষেধ করেন এবং ‘ঈদুল ফিত্বর’ ও ‘ঈদুল আযহা’-কে মুসলিমদের জন্য আনন্দের দিন নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ঐ দু’দিনের পরিবর্তে দু’টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন— ‘ঈদুল আযহা’ ও ‘ঈদুল ফিত্বর’।[৫]

ঈদের ছালাতের আগে করণীয়:

(১) ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বা ফিত্বরা আদায় করতে হবে ঈদগাহে বের হওয়ার আগেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক ছা‘ (প্রায় ২.৫০ কেজি) পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ফিত্বরা হিসাবে আদায় করা ফরয।[৬] উল্লেখ্য, ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার আগেই ফিত্বরা আদায় করতে হবে। তবে, সর্বোচ্চ ২/১ দিন পূর্বেও আদায় করা যায়।

(২) পুরুষগণ ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে মিসওয়াক ও ওযূ-গোসল করে, তৈল-সুগন্ধি ব্যবহার ও সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।[৭] মহিলারা আভ্যন্তরীণভাবে সুসজ্জিত হবে। তারা সুগন্ধি মেখে ও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে বের হবে না। তারা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করবে না।

(৩) মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে শরীর আবৃত করে তথা পর্দার বিধান মেনে পুরুষদের পিছনে ঈদের জামাআতে শরীক হবে। ঋতুমতী মহিলারা কাতার থেকে সরে ঈদগাহের এক পার্শ্বে অবস্থান করবে। তারা কেবল খুৎবা শ্রবণ এবং দু‘আয় অংশ গ্রহণ করবেন।[৮] এখানে দু‘আ বলতে সম্মিলিত দু‘আ বুঝানো হয়নি।

(৪) ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহের দিকে ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিজোড় সংখ্যক খেজুর কিংবা অন্য কিছু খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিনে কিছু না খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল।[৯]

(৫) পায়ে হেঁটে এক পথে ঈদগাহে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসা সুন্নাত।[১০]

ঈদের দিনের তাকবীর এবং তা পড়ার নিয়ম:

রামাযান মাসের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর তথা ঈদের রাত্রি থেকে তাকবীর পাঠ শুরু করতে হয় *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। এটা ঈদের খুৎবা শুরুর পূর্বপর্যন্ত চলতে থাকবে।[১১] রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে ঈদের দিন সকালে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহ

১. ড. ফজলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৭২৬।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪।
৩. মুস্তফা সাঈদ ও সহযোগীবৃন্দ, আল ফিক্বহুল মানহাজী, ১/২২২।
৪. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়ায : দারুস সালাম, ১৪১৪/১৯৯৪), পৃ. ২৩১-৩২।
৫. আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪; নাসাঈ, হা/১৫৫৬; মিশকাত, হা/১৪৩৯।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৮৮৬; মিশকাত, হা/১৩৮১।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৯৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০।
৯. তিরমিযী, হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৬।
১০. ইবনু মাজাহ, হা/১৩০১; দারেমী, হা/১৬১৩; আহমাদ, হা/৮১০০; মিশকাত, হা/১৪৪৭।
১১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল (বৈরূত : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), ৩/১২৫।

অভিমুখে রওয়ানা দিতেন এবং এভাবে তিনি ঈদগাহে পৌঁছে যেতেন।[১২] ঈদের তাকবীরের শব্দগুলো নিম্নরূপ :

أَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।[১৩] উল্লেখ্য, মহিলারা নিঃশব্দে তাকবীর পাঠ করবে।[১৪]

ঈদের ছালাতের সময়, স্থান ও মাসায়েল:

(১) সূর্য উদিত হলে আনুমানিক ১৫ মিনিটি পর ঈদের ছালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত এর সময় বাকী থাক। এটাই জমহূর আলেমের মত।[১৫] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ঈদের ছালাতের সময় সম্পর্কিত সকল হাদীছ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফিত্বরের ছালাত আদায় করা উত্তম।[১৬]

(২) খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত জামাআতসহ আদায় করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা ঈদের ছালাত খোলা ময়দানে আদায় করতেন।[১৭] বৃষ্টি, ভীতি কিংবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে উন্মুক্ত ময়দানে ছালাত আদায় অসম্ভব হলেই কেবল মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যায়।[১৮] বায়তুল্লাহ ব্যতীত বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে বিনা কারণে ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করা সুন্নাতবিরোধী কাজ।

(৩) ঈদের ছালাতের জন্য কোনো আযান কিংবা ইক্বামত নেই।[১৯] ঈদের ছালাতের জন্য মানুষকে ডাকাডাকি করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।[২০]

(৪) জামাআতের পরে ঈদের ছালাতের খুৎবা হবে। জামাআতের পূর্বে কোনো খুৎবা প্রদানের বিধান শরীআতসম্মত নয়।[২১] ঈদের ছালাতের খুৎবা একটি।[২২] একটি খুৎবা প্রদানই ছহীহ হাদীছসম্মত।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে ঈদগাহে যাওয়ার সময় একটি লাঠি বা বল্লম নিয়ে যাওয়া হতো এবং ছালাত শুরু হওয়ার পূর্বে তা সুতরা হিসাবে ইমামের সামনে মাটিতে গেড়ে দেওয়া হতো।[২৩] ঈদের ছালাতের পূর্বে কোনো সুন্নাত কিংবা নফল ছালাত নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদায় করেননি।[২৪]

(৬) ঈদের জামাআত না পেলে দু'রাকআত ক্বাযা আদায় করতে হবে।[২৫]

(৭) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরামের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা'। অর্থাৎ 'আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হতে কবুল করুন!'[২৬]

(৮) দান-ছাদাক্বা করা ঈদের দিনের অন্যতম নফল ইবাদত। এদিনে দান-ছাদাক্বার গুরুত্ব এত বেশি যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই খুৎবা শেষ করে বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিয়ে মহিলাদের সমাবেশে গেলেন ও তাদেরকে দান-ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন। মহিলারা নেকীর উদ্দেশ্যে নিজেদের গয়না খুলে বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে দান করলেন।[২৭]

ঈদের ছালাতের তাকবীর সংখ্যা:

ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ ছাড়াও ১২ তাকবীরের পক্ষে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ছাহাবীগণ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক শুধু ছহীহ হাদীছই বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের প্রমাণে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না। অথচ এটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ

১২. বায়হাক্বী, ৩/২৭৯, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৬৫০, ৩/১২৩।
১৩. আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৯৫৩৮; দারাকুত্বনী, হা/১৭৫৬।
১৪. তাফসীরে কুরতুবী, ২/৩০৭, ৩/২-৪; বায়হাক্বী, ৩/৩১৬।
১৫. ইবনু আবেদীন, ১/৫৮৩।
১৬. যাদুল মা'আদ।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯।
১৮. আল-মুগনী, ২/২৩৫; ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩১৮।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৬।
২০. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৩।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪।
২২. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৫।
২৩. ছহীহ বুখারী, পৃ. ১৩৩।
২৪. ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৯; তিরমিযী, হা/৫৩৭।
২৫. ছহীহ বুখারী, ২/২৩।
২৬. তামামুল মিন্নাহ, ১/৩৫৪, সনদ হাসান।
২৭. ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪২৯।

আজ দ্বিধা বিভক্ত। নিম্নে কতিপয় দলীল প্রদত্ত হলো, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا 'ঈদুল ফিত্বর-এর প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর উভয় রাকআতে ক্বিরাআত পড়তে হবে তাকবীরের পর'।[২৮]

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার ছালাতে (রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া) প্রথমে সাত আর পরে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২৯] ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'দুই ঈদের তাকবীর হবে— প্রথম রাকআতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ'।[৩০] উক্ত হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন।[৩১]

এছাড়াও আরও অনেক আছার বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর গোলাম নাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 'আমি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বর-এর ছালাতে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন'।[৩২] ইমাম মালেক, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, বায়হাক্বী, দারাকুত্বনী, আলবানী (রাহিমাহুমুল্লা-হ)-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ উক্ত আছারকে 'ছহীহ' বলেছেন।[৩৩] আম্মার ইবনু আবী আম্মার বর্ণনা করেন, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ 'ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকআতে সাত আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[৩৪] ইমাম বায়হাক্বী ও আলবানী (রাহিমাহুমাল্লা-হ) একে 'ছহীহ' বলেছেন।[৩৫]

ঈদের ছালাত আদায়ের সংক্ষিপ্ত নিয়ম:

ঈদের ছালাত দু'রাকআত।[৩৬] নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে হাত বাঁধতেন। অতঃপর ছানা পড়তেন।[৩৭] অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই এক এক করে মোট সাতটি তাকবীর দিতেন। প্রত্যেক দু'তাকবীরের মাঝে তিনি একটু চুপ থাকতেন। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু'হাত উঠাতেন এবং পরে আবার হাত বাঁধতেন।[৩৮] এভাবে সাতটি তাকবীর বলার পর নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সূরা ফাতেহা পড়তেন। এরপর তিনি আরেকটি সূরা মিলাতেন। ঈদের ছালাতে সাধারণত নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রথম রাকআতে সূরা ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-ক্বামার পড়তেন।[৩৯] অথবা প্রথম রাকআতে সূরা আল-আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-গাশিয়া পড়তেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এভাবে প্রথম রাকআত শেষ করতেন। সিজদা থেকে উঠে তিনি দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই পরপর পাঁচটি তাকবীর দিতেন। অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ে তার সাথে আরেকটি সূরা মিলাতেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করে শেষ বৈঠকের মাধ্যমে ছালাত শেষ করতেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ঈদের মাঠে মিম্বার নেওয়া হতো না।[৪০]

মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে ঈদসহ সবক্ষেত্রে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত বাস্তবায়ন করার এবং যাবতীয় বিদআত পরিহার করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২৮. আবূ দাঊদ, হা/১১৫১ ও ১১৫২, সনদ ছহীহ।
২৯. ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০; আবূ দাঊদ, হা/১১৪৯, সনদ ছহীহ।
৩০. তারীখু ইবনু আসাকির, ১৫/১৬, হা/১১৫৩৫ ও ১১৫৩৬, (৫৪/৩৭৯), ২/১৬৫; তারীখে বাগদাদ, ২/৪১৩ (১০/১৬৪)।
৩১. তারীখু বাগদাদ, ২/৪১৩; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০; ইবনু মাজাহ, হা/১০৬২।
৩২. আল-মুওয়াত্ত্বা, ১/১৮০ (১০৮-১০৯)।
৩৩. আল্লামা যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ (রিয়ায ছাপা : ১৯৭৩), ২/২১৮; তালখীছুল হাবীর, ২/২০১; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০।
৩৪. ইবনু আবী শায়বা, ২/৮১; বায়হাক্বী, ৩/৪০৭, হা/৬১৮০।
৩৫. বায়হাক্বী, ৩/৪০৭; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১১।
৩৬. নাসাঈ, ৩/১৮৩; আহমাদ, ১/৩৭।
৩৭. ইবনু খুযায়মা।
৩৮. যাদুল মা'আদ, ১/৪৪১।
৩৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮,৮৯১; তিরমিযী, হা/৫৩৪।
৪০. যাদুল মা'আদ, ১/৪২৯।

বর্তমানে প্রচলিত পহেলা বৈশাখ

-মো. জাকির হোসাইন*

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ২ মাস পরপর ঋতু পরিবর্তনের কারণে এই দেশ একেক সময় একেকটি রূপ ধারণ করে। আর এই ঋতুতে কিছু দিনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমরা যেমন বাঙালি, তার চেয়ে বড় কথা হলো আমরা মুসলিম। প্রত্যেকটি উৎসব পালন করার আগে আমাদের দেখা উচিত এটি ইসলাম সমর্থন করে কিনা? এধরনের উৎসবের মধ্যে একটি হচ্ছে পহেলা বৈশাখ— যা আমরা প্রতি বছর পালন করে থাকি।

বৈশাখ পরিচিতি: প্রতি বছর এপ্রিল মাসে আমরা বাংলাদেশীরা একটি উৎসব পালন করে থাকি, তা হলো ১৪ এপ্রিল। অর্থাৎ সেটি বাংলা বর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ। আমাদের দেশে প্রচলিত বাংলা সন মূলত ইসলামী হিজরী সনেরই একটি রূপ। ভারতে ইসলামী শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারেই সকল কাজকর্ম পরিচালিত হতো। আর হিজরী পঞ্জিকা চন্দ্রমাসের উপর নির্ভরশীল। চন্দ্রবৎসর সৌরবৎসরের চেয়ে প্রায় ১১ দিন কম হয়। কেননা সৌরবৎসর ৩৬৫.২৫ দিন, আর চন্দ্রবৎসর ৩৫৪.৩৭ দিন। আর এ কারণেই চন্দ্রবৎসর ঋতুগুলো ঠিক থাকে না। কিন্তু বিশেষ করে চাষাবাদ ও এজাতীয় অনেক কাজ ঋতুর সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য ভারতের মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে প্রচলিত চন্দ্রনির্ভর হিজরী পঞ্জিকাকে সৌরপঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পহেলা বৈশাখের ইতিহাস: মোগল সম্রাট আকবর তার দরবারের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ সিরাজীকে হিজরী চন্দ্রবর্ষ পঞ্জিকাকে সৌরবর্ষ পঞ্জিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। ৯৯২ হিজরী মোতাবেক ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর এ হিজরী সৌরবর্ষ পঞ্জির প্রচলন করেন। তবে যেহেতু তিনি ২৯ বছর পূর্বে তার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাই সেই সময় থেকে পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরী সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু করা হয়। ইতিপূর্বে চৈত্র মাস ছিল প্রথম মাস। কিন্তু ৯৬৩ হিজরী সালের মুহাররম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ মাস। এজন্য বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস এবং পহেলা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়।

পহেলা বৈশাখে কার্যাবলি: সেই সময় থেকেই বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে পহেলা বৈশাখে কিছু আয়োজন করা হতো। প্রজারা চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করতেন এবং পহেলা বৈশাখে জমিদারগণ প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন এবং সাথে কিছু আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থা করতেন। এছাড়া বাংলার সকল ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসার পুরনো হিসাব শেষে করতেন এবং পহেলা বৈশাখে 'হালখাতা' করতেন। আর এর মাধ্যমে আবার বছরের নতুন হিসাব পুনরায় শুরু করতেন। পহেলা বৈশাখে কার্যাবলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যা ব্যক্তি, জাতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

বর্তমান সময়ের পহেলা বৈশাখ: বর্তমানে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে যেসমস্ত কাজ করা হচ্ছে, তা পূর্বের কোনো বাঙালিরা করেননি, এমনকি তারা এই ধরনের নিকৃষ্ট কাজের চিন্তাভাবনাও করেননি। বর্তমানে বাংলাদেশে যেভাবে পহেলা বৈশাখ পালন করা হচ্ছে, তা ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে চরমভাবে সাংঘর্ষিক। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতিদের অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

পোশাকে নোংরামি: পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার পোশাক। পোশাকে থাকছে ঢোল, তবলা, গিটার ও নানান ধরনের বাদ্য যন্ত্র, যা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর সুন্দর, সামাজিক, তাক্বওয়াশীল পোশাক পরিধান করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ 'হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের উপর পোশাক অবতীর্ণ করেছি, তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং শোভাবর্ধনের জন্য। আর তাক্বওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক। ওটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটা যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আল-আ'রাফ, ৭/২৬)*।

মানুষ আজকে লোক দেখানোর জন্য পোশাক পরিধান করছে। পুরুষের পোশাক নারীরা আবার নারীদের পোশাক পুরুষরা পরিধান করছে। যেটাকে ইসলামী শরীআতে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐসব পুরুষকে লা'নত করেছেন, যারা নারীর বেশ

* চারঘাট, রাজশাহী।

www.al-itisam.com

ধরে এবং ঐসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধরে’।[১]

বিভিন্ন দিবস পালন করতে গিয়ে যে সমস্ত পোশাক পরিধান করা হয়, তার বেশিরভাগই বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পোশাকের ব্যাপারে কঠিন ভাষায় উল্লেখ করে বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে’।[২]

বর্তমানে যে সমস্ত পোশাক মেয়েরা ব্যবহার করছে, তার প্রায় ৯০ ভাগ মহিলা পাতলা, আঁটোসাঁটো এবং আকৃষ্টকারী পোশাক পরিধান করছে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলোর নিষেধাজ্ঞা জারী করে বলেন, ‘দুই শ্রেণির জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। প্রথম শ্রেণি- যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় ছড়ি, তা দ্বারা তারা লোকদেরকে প্রহার করবে। দ্বিতীয় শ্রেণি- ঐ সকল নারী, যারা পোশাক পরিহিতা অথচ উলঙ্গ। পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্টকারিণী এবং নিজেরাও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে লম্বা গ্রীবাবিশিষ্ট উটের কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।[৩]

পোশাকের ব্যাপারে সর্বশেষ কথা হলো, কোনো প্রাণীর ছবিযুক্ত কোনোকিছু ব্যবহার করা যাবে না। আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘যে বাড়িতে কুকুর থাকে এবং প্রাণীর ছবি থাকে, সে বাড়িতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না’।[৪]

দিবসের নামে অশ্লীলতা: বর্তমান বিশ্বে আমারা দেখতে পাচ্ছি যে, নির্দিষ্টভাবে কোনো দিবস পালন করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি শিরক, বিদআত, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও মাদক গ্রহণের মতো ধ্বংসাত্মক কাজগুলো বেশি হচ্ছে। যেমন: ইংরেজি ক্যালেন্ডারের শেষ দিন থার্টিফাস্ট নাইট ও প্রথম দিন নিউ ইয়ার বা নববর্ষ পালন করতে গিয়ে আমাদের বেহায়াপনার শেষ থাকে না। ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতিরা অতি সহজে বিভিন্ন ধরনের কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ তাআলা এ থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যার উপর নিয়োজিত রয়েছেন কঠোর হৃদয়সম্পন্ন ফেরেশতাগণ, তারা আল্লাহ যা নির্দেশ করেন তা বাস্তবায়নে অবাধ্য হন না, আর তাদের যা নির্দেশ প্রদান করা হয়, তারা তাই করেন’ *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*। কোনো পরিবারের স্ত্রী, কন্যা ও সন্তানাদি তখনই ঐসব পাপ করার সুযোগ পায়, যখন তার অভিভাবক এ বিষয়ে চুপ থাকে অথবা সুযোগ দেয় বা সহযোগিতা করে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তানদের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার সুযোগ দেয়, তাকে দাইয়ূস বলা হয়। রাসূল ﷺ এদের ব্যাপারে বলেন, ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ ‘তিন শ্রেণির ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত হারাম করেছেন— ১. মাদকাসক্ত, ২. পিতা-মাতার অবাধ্য এবং ৩. দাইয়ূস, যে তার পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতার স্বীকৃতি দেয়’।[৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য সকল প্রকার দায়িত্বশীলকে লক্ষ্য করে বলেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। রাষ্ট্রনেতা তার প্রজাদের সম্পর্কে দায়িত্বশীল আর তাকে তার পরিচালনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন পুরুষলোক তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাকে তাদের পরিচালনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন মহিলা তার স্বামীর ঘরের সার্বিক ব্যাপারে দায়িত্বশীলা, তাকে সেটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন গোলাম তার মালিকের সম্পদের সংরক্ষক আর তাকে সেটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে’।[৬]

সুতরাং প্রত্যেক প্রকার দায়িত্বশীলের উচিত, সকল প্রকার ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং খারাপ কাজে সামর্থ্যানুযায়ী বাধা প্রদান করা। আর যদি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি অশ্লীলতা ছড়াতে চায়, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ‘যারা চায় যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক তাদের জন্য দুনিয়াতে ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না’ *(আন-নূর, ২৪/১৯)*।

সুধী পাঠক! আসুন আমরা বর্তমানে প্রচলিত পহেলা বৈশাখ ও থার্টিফাস্ট নাইটসহ সকল প্রকার অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান ও সব ধরনের কাবীরা গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকি। মহাল আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন- আমীন!

---

১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫; মিশকাত, হা/৪৪২৯।
২. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭, হাসান।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৮।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫৭।
৫. আহমাদ, হা/৫৩৭২; মিশকাত, হা/৩৬৫৫। হাদীছটি ছহীহ।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫২০০; ছহীহ মসলিম, হা/১৮২৯।

শিক্ষকের ভূমিকা এবং তার প্রতি ছাত্র ও সমাজের কর্তব্য

[২৮ রজব, ১৪৪৫ হি. মোতাবেক ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. ছালেহ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু হুমাইদ*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই, যিনি সুউচ্চ জ্ঞানের অধিকারী এবং সর্বোত্তম পুরস্কারদাতা। আমি ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবী ও তাঁর অনুসারীদের উপর ছালাত ও সালাম অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, হে মানুষ সকল! আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে আল্লাহভীতির অছিয়ত করছি। আমি আপনাদেরকে সর্বপ্রথম, সবচেয়ে মূল্যবান ও অধিক অর্থজ্ঞাপক তাক্বওয়ার অছিয়ত করছি যে তাক্বওয়ার অছিয়ত মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উম্মাহকে করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ 'আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো' *(আন-নিসা, ৪/১৩১)*।

অতএব, মহান আল্লাহকে ভয় করে চলুন, আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করবেন। জেনে রাখুন! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই আপনাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আপনাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, যাতে আপনারা তাঁর তাওহীদ তথা একত্ব ঘোষণা করতে পারেন। তিনি আপনাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে আপনারা তাঁর আনুগত্য করতে পারেন। সর্বোপরি তিনি আপনাদের নিকটে রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন, যাতে আপনারা তাঁর অনুসরণ করেন।

হে আল্লাহর বান্দা! জেনে রাখুন, নিশ্চয় প্রত্যেক যৌবনের পরেই বার্ধক্য রয়েছে। সুস্থতার পরেই অসুস্থতা রয়েছে। দুনিয়ার জীবনের পরেই সুনিশ্চিত মৃত্যু রয়েছে। সুতরাং আপনি বার্ধক্য আসার পূর্বেই যৌবনকালকে মূল্যায়ন করুন। অসুস্থতা আসার পূর্বেই সুস্থতাকে কাজে লাগান আর মৃত্যু আসার পূর্বেই দুনিয়ার জীবনকে মূল্যায়ন করুন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ - إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ 'হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রবঞ্চিত না করে। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; কাজেই তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তো তার দলবলকে ডাকে শুধু এজন্য যে, তারা যেন প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী হয়' *(ফাত্বির, ৩৫/৫-৬)*।

হে মুসলিমগণ! তা'লীম বা শিক্ষাই অগ্রগতির চাবিকাঠি এবং নবজাগরণের পথ। এটি ভবিষ্যৎ উন্নতি লাভের পথনির্দেশ করে। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মনন ও সৃজনশীলতা তৈরি হয়। শিক্ষার মাধ্যমে আক্বীদা ও বিশুদ্ধ তাওহীদের ভিত তৈরি হয়। বিশুদ্ধ শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল একজন শিক্ষার্থী ইসলামকে সঠিক, পরিপূর্ণ ও মধ্যমপন্থার সাথে বুঝতে সক্ষম হয়।

হে উপস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! শিক্ষা কার্যক্রম তখনই সফল হয় যখন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে, সফলতার সাথে শিক্ষক তার দায়িত্ব পালন করে এবং খুব দক্ষতার সাথে তার বার্তা ছাত্রদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। একটি শিক্ষা কার্যক্রম তখনই সফলতা পায় যখন শিক্ষক তার মহান দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকেন।

হে মুসলিমগণ! একজন শিক্ষক একটি সফল শিক্ষা কার্যক্রমের মূল কারিগর। শিক্ষক জাতির খুঁটি এবং তার উচ্চ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল নবজাগরণ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটা সম্ভব।

প্রকৃত শিক্ষক তিনিই যার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান মানুষ গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃত শিক্ষক ব্যতীত কোনো পেশাজীবী ও বিশেষজ্ঞ তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। একজন আদর্শ শিক্ষকই

ব্যক্তি ও সামাজিকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার বিকাশ ঘটাতে পারেন। আল্লাহর ইচ্ছায় একজন শিক্ষকই জাতির বিবেকবোধ তৈরির কারিগর। তার হাত ধরেই আদর্শ আলেম, দাঈ, বিচারক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, সৈনিক, কৃষক, প্রস্তুতকারক ও অন্যান্য পেশাজীবী তৈরি হয়ে থাকে।

হে উপস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! নিশ্চয়ই শিক্ষাদান একটি শিল্প যা সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর মহান শিক্ষকগণ আল্লাহর অনুগ্রহে জীবনকে কল্যাণের দিকে পরিবর্তন করাতে সক্ষম। শিক্ষকগণই হচ্ছেন উত্তম আদর্শ, যারা তাদের ছাত্রদের জীবনে বড় প্রভাব রাখেন।

হে মুসলিমগণ! একারণে একজন যোগ্য শিক্ষক মাত্রই একনিষ্ঠ, দ্বীনকে মযবূতভাবে আঁকড়ে ধারণকারী, সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বীয় কর্মে সুশৃঙ্খল, ন্যায়নিষ্ঠ ও শক্তিশালী হবেন। তিনি প্রকৃত পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন, বাস্তবতা বুঝতে পারেন। তিনি পাঠদানের বিষয় সম্পর্কে দক্ষ, সহনশীল, উদার, নমনীয়, ধৈর্যশীল এবং সকল পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম। একজন যোগ্য শিক্ষক স্বীয় পাঠদানের বিষয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। তিনি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্ম সম্পর্কে সচেতন হবেন, ভালো আচরণের দিক দিয়ে একজন আদর্শবান, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ এবং আমলে মধ্যপন্থি হবেন।

হে সম্মানিত শিক্ষক! নিশ্চয় আপনার হাতে উম্মাহর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তথা ইলম রয়েছে। আপনার হাতে এমন মহা মূল্যবান প্রাচুর্য রয়েছে, যার সামনে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ মূল্যহীন। এটি হচ্ছে মানুষের অর্জিত সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আপনিই ইলমের বাহক, জাতি গড়ার কারিগর। আপনি হলেন মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদাতা। আপনিই স্বীয় সুশিক্ষা, সত্যনিষ্ঠ নির্দেশনার মাধ্যমে যুবকদেরকে তাদের পিতা-মাতার চোখের মণি, তাদের স্বদেশের জন্য একটি সম্পদ এবং নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির নির্মাতা হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন।

আপনি নিজেকে সৎ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আপনিই হতে পারেন জাতির রোল মডেল। অবশ্যই আপনি কথায় ও কাজে এবং ভেতর ও বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে বৈপরীত্য তৈরি হওয়া থেকে সতর্ক থাকবেন; কেননা কথা ও কাজের বৈপরীত্য মারাত্মক ক্ষতিকর। নিশ্চয়ই আপনার কথা, কর্ম, বাহ্যিক রূপ, সমস্ত কর্মকাণ্ড ও অবস্থা ছাত্রদেরকে প্রভাবিত করে। অতএব, আপনার দায়িত্ব হলো ইলম বিতরণ করা, তাযকিয়্যাহ বা আত্মার পরিশুদ্ধি শিখানো, সঠিক পথ নির্দেশ করা এবং সর্বোপরি একটি সৎ জীবন যাপনের ভিত গড়ে দেওয়া।

হে শিক্ষকগণ! আপনারাই হলেন ইলমের যোগ্য উত্তরসূরি। আপনাদের মধ্যে যারা ইলম শিক্ষা দিবে তাদের জন্য আমলকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব লিখা হবে। যাতে আমলকারীর আমলনামা থেকে সামান্য পরিমাণ কর্তন করা হবে না। এ মর্মে নবী ﷺ থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জ্ঞানীরা হলেন নবীদের উত্তরসূরি। নবীগণ কোনো দীনার বা দিরহাম মীরাছরূপে রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকারসূত্রে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে'।[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়; তিন প্রকার আমল ছাড়া— ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয়, ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে'।[২] এই হাদীছে বর্ণিত তিন প্রকারের মধ্যে আপনিও একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। তাই মানুষকে দান-ছাদাক্বার পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক হিসেবে আপনিও তার ছওয়াবে অংশীদার হবেন। কাজেই যা কিছু দান করা হয় এবং যা কিছু অছিয়ত করা হয় আপনারা তাতে অংশীদার ও উত্তরাধিকারী। একটি ভালো সন্তান মূলত ইলম, উত্তমভাবে লালনপালন এবং পরিশুদ্ধি অর্জনের ফসল। আলেম ও শিক্ষক যে পুরস্কার লাভ করেন তা কতই না বড় পুরস্কার! আর এর প্রভাব কতই না সুদূরপ্রসারী!

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! নিশ্চয়ই শিক্ষকের মর্যাদা সুসংহত করতে, তার সম্মান ছড়িয়ে দিতে এবং তার মর্যাদা রক্ষা করতে মিডিয়ার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে উপন্যাস, গল্প, সিরিজ এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বড় ভূমিকা রয়েছে। কাজেই কোনোভাবেই যেন শিক্ষকের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা না হয়, তার পেশাকে ছোট করে দেখা না হয় বা তার কোনো বক্তব্য নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো না হয় সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

---

১. আবূ দাঊদ, হা/৩৬৪১, হাদীছ ছহীহ।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১।

www.al-itisam.com

অতঃপর, আল্লাহ আপনাদেরকে হেফাযত করুন। সুতরাং শিক্ষার উন্নতির জন্য নেওয়া প্রতিটি উদার প্রচেষ্টা ও শিক্ষার পরিবেশকে সুন্দর করতে গৃহীত সকল প্রশংসনীয় পদক্ষেপ উত্তম শিক্ষক ও দক্ষ উস্তায তৈরি করে; কেননা এটি তারবিয়্যাহ ও তা'লীমের লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

যোগ্য শিক্ষকের মাধ্যমে প্রজন্ম উন্নত হয়, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে উম্মাহ এগিয়ে যায় এবং শিক্ষকের দুর্বলতার কারণে জাতি দুর্বল হয়। প্রতিটি মহান জাতি গঠনের পেছনে যেমন একজন মহান শিক্ষকের অবদান রয়েছে, তেমনি প্রতিটি আদর্শ শিক্ষা বিস্তারের পেছনেও রয়েছে একজন মহান শিক্ষকের অবদান। প্রস্তুতি গ্রহণ, ধার্মিকতায়, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিকভাবে যোগ্য শিক্ষকের মাধ্যমেই কেবল সুশিক্ষা আশা করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ 'যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর তা শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না। কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫১-১৫২)*।

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، وبسنة نبيه محمد .

দ্বিতীয় খুৎবা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর। তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবী এবং তাঁর সকল অনুসারীদের উপর শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক।

হে মুসলিমগণ! শিক্ষককে সম্মান করা ও তার হক্ব সম্পর্কে জানা আল্লাহর তাওফীক্ব ও হেদায়াত লাভের অংশ। আর যে এতে অবহেলা ও ত্রুটি করবে তার জন্য ক্ষতি ও লাঞ্ছনা রয়েছে। উবাদা ইবনু ছামেত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না'।[৩]

হে সৌভাগ্যবান যোগ্য ছাত্র! যিনি তোমাকে একটি মাত্র হরফও শিখিয়েছেন তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। শিক্ষকের কাছে ইলম অর্জনের পূর্বে সচ্চরিত্রবান হও এবং পাঠ গ্রহণের পূর্বে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা করো। শিক্ষকের কৃত সঠিক কাজে তাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করো। তবে তিনি কোনো কাজে ভুল করলে সেক্ষেত্রে তাকে তোমরা অনুসরণ করো না। শিক্ষকের ব্যাপারে তোমার চোখ যা দেখেছে এবং তোমার কান যা শুনেছে তা আমানতের সাথে সংরক্ষণ করো। অবশ্যই তার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে তার সম্মানকে অক্ষুণ্ন রাখবে। ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা একজন শিক্ষার্থীর শিষ্টাচার যে, শিক্ষকের মতের সাথে নিজের মত না মিললেও সে শিক্ষকের সন্তুষ্টি কামনা করে, তার অনুপস্থিতিতে গীবত করে না, তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে না, তার ব্যাপারে নিজের মধ্যে পূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ রাখে এবং হৃদয় থাকে উদ্বেগমুক্ত। সে কোমলতার সাথে শিক্ষককে প্রশ্ন করে, উত্তমভাবে সম্বোধন করে এবং অনুপযুক্ত কিছু জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকে।

সাবধান! আপনারা সকলেই আল্লাহকে ভয় করে চলুন, আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন। হে সম্মানিত মাতা ও পিতাগণ! আপনারা আল্লাহভীতি অবলম্বন করুন। আপনারা শিক্ষকদের সংস্পর্শে থাকুন। আপনারা সন্তানদেরকে শিক্ষকের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার শিক্ষা দিন। কখনোই তাদের শিক্ষককে অপমান বা অবজ্ঞা করার অনুমতি দিবেন না। তাদেরকে শিক্ষার আদব, কথোপকথনের আদব এবং প্রশ্ন করার আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দিন; যাতে তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং উত্তম শিষ্টাচার ধারণ করতে পারে।

ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের হক্ব হলো তার গুণাবলি প্রকাশ করা, তার দোষত্রুটি গোপন রাখা এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা। আর কেউ শিক্ষককে অপমান করলে তাকে প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার বিশাল সৃষ্টিজগতের সামান্য সৃষ্টি। আমাদের পাপের কারণে তোমার অনুগ্রহ আমাদের থেকে সরিয়ে নিয়ো না। আমরা একমাত্র তোমার উপরেই ভরসা করি।

৩. আহমাদ, হা/২২৭৫৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৯৫।

সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার: সাম্রাজ্যবাদীদের নীল নকশা

-মাযহারুল ইসলাম*

[১]

ইসলাম পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন মানবিক ধর্ম। মানবিক, সামাজিক, পারিবারিক ছাড়াও রাষ্ট্র পর্যন্ত সুষম নীতিমালা নির্ধারিত রয়েছে কেবল ইসলাম ধর্মে। ফলে সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতার বিষয়টি সব মত, পথ ও দল থেকে ভিন্ন এবং সুস্পষ্ট। পৃথিবীর ইতিহাস বলছে, এ যাবৎ পৃথিবীতে যত সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটেছে, তার মৌলিক কারণ হলো— নৈতিকতা। যে জাতি মানবিক চাহিদা তথা যৌনতার ব্যাপারে যত বেশি সংযমী, সে জাতি তত বেশি সমৃদ্ধশালী ও অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে সাথে সভ্যতার শোচনীয় দুরবস্থা, অধঃপতনের অন্যতম কারণ ছিল— অবাধ যৌনাচার, অনিয়ন্ত্রিত ও বিকৃত যৌনাচার এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। বিশ্বব্যাপী ইসলামের শত্রুরা পৃথিবীতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বহুকাল থেকেই ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তৈরি করে চলেছে। তাদের সেই নীল নকশার মধ্যে অন্যতম একটি হলো— ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা। যত দিন যাচ্ছে, ততই তাদের কার্যক্রম, কাজের কৌশল, পরিধি বৃদ্ধি করছে। গোটা বিশ্ব জুড়ে তাদের এই নগ্ন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রান্সজেন্ডার, সমকামিতাকে মানব মনে স্বাভাবিকরণ ও মানুষকে এর প্রতি সহনশীল করে তোলার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তার বাস্তব প্রয়োগও ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ এই ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা নিঃসন্দেহে ইসলামী শরীআতে হারাম এবং মানুষের স্বভাবজাত মানবিক মূল্যবোধ, আল্লাহর দেওয়া ফিতরাতবিরোধী জঘন্য পাপ। এমনকি এটা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড। নিঃসন্দেহে এটাকে সমর্থন করা, বৈধতা প্রদান করার অর্থই হলো— নৈতিক মূল্যবোধ, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা। সর্বোপরি আল্লাহর ফিতরাতবিরোধী কার্যক্রম দ্বারা আল্লাহকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো- যা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামান্তর। খোদ ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান মহল তো এটাই চায়। তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুসলিমবিশ্বকে করায়ত্ত করতে চায়। তারা তাদের মতাদর্শ ছাড়াও বিভিন্ন কিছু চাপিয়ে দিতে চায়। মুসলিমদের আদর্শিক পরাজয় চায়। সেটা মুসলিমরা ইচ্ছায় মানুক কিংবা অনিচ্ছায়। এই বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে তারা পৃথিবীর উপর অনেক আগ থেকেই বিজয়ের পথে পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য নানা ধরনের নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করে চলেছে। বিজ্ঞান বলছে, ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতার কোনো ভিত্তি নেই, এটি জন্মগত না; বরং এটি হচ্ছে স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া একটি বিকৃতি। এই বিকৃতিটাই তারা ছড়িয়ে দিতে চায় গোটা বিশ্বে। বিভিন্ন এনজিও, সংস্থা আর সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। রিপোর্ট বলছে, পৃথিবীর ১৯৫টিরও বেশি দেশ সমকামিতার বৈধতা দিয়েছে। এমনকি সমকামী বিয়ে বৈধতা দেওয়া হয়েছে ২৭টির বেশি দেশে। মূলত এই লজ্জাজনক, ন্যাক্কারজনক কাজটা একদিনে হয়নি, বরং এই কাজে সফল হতে তাদের কয়েক দশক সময় লেগেছে। কিন্তু তারা তাদের মিশন চালাতে পিছপা হয়নি। বরং এই কাজে অর্থ, সময়, বুদ্ধি, শ্রম চলমান রেখেছিল, সেই সাথে তারা বিভিন্ন এনজিও, সমাজসেবা সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আর বিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যমে গোটা দুনিয়ায় তাদের এই মত, পথ সর্বমহলে শিথিল, সহনশীল ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বৈশ্বিক এজেন্ডা হিসেবে তাদের বিভিন্ন এনজিও, সমাজসেবা সংস্থা, দেশি-বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অনেক প্লাটফর্ম কাজ করে চলছে। তন্মধ্যে OHCHR, UNDP, UNICEF, UNODC, UNESCO, UNAIDS, WFP ছাড়াও আরো অনেক বিশ্বসংস্থা বিদ্যমান।

সমকামিতাকে স্বাভাবিক বিষয় বলে উপস্থাপন করার জন্য দেশি-বিদেশি বিভিন্ন নাটক-সিনেমাতেও এর বিভিন্ন চরিত্র ইতিপূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এটা তাদের আরেকটি টোপ। যেই টোপ গোটা বিশ্ব সহজেই গিলবে বলে তারা এমনটি করেছে। কারণ হলো পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিশেষ করে যুবক প্রজন্ম হলিউড মুভি, সিরিজের নীরব দর্শক। ফলে এগুলো মুভি, সিনেমাতে উপস্থাপন করার মাধ্যমে একসময় এটাকে তারা স্বভাবজাতভাবেই স্বাভাবিক বলে মনে করতে বাধ্য হবে। এমনকি কোনো একসময় এর পক্ষে সাফাই গাইবে।

এমনিভাবে তারা বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতিকেও করায়ত্ত করেছে। বিশ্বের বড় বড় ধনী গ্রুপ, কোম্পানি, কর্পোরেশন থেকে অনুদান গ্রহণ করে। অ্যাপল, মাইক্রোসফট কিংবা আমাজন সবার কাছ থেকে পাওয়া অনুদান গ্রহণ করার মাধ্যমে তারা সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার ছাড়াও যত ধরনের বিকৃত মানসিকতা, মূল্যবোধ আছে- সেই খাতে তারা তাদের অর্থ যোগান দিয়ে চলেছে। ফলে বিশ্বব্যাপী তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে শিশু-কিশোরও। তারা বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, হাইস্কুল, প্রাইমারি স্কুল ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে পড়ালেখার নামে 'যৌনাচার, সমকামিতা' শিক্ষা দিচ্ছে। এজন্য তারা একটি ঐক্য পরিষদ

* দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা; শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

তৈরি করেছে নাম দিয়েছে— Gay Straight Alliance Club. তাদের কাজেই হলো প্রতিটি স্কুলের শিশুদের শিশুমনে সমকামিতার প্রসার এবং স্বাভাবিককরণ করা। গোটা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে যৌনাচারের নোংরামি শিক্ষা দিয়ে সমাজ, জীবনকে অধঃপতিত ও একটি অসভ্য সমাজ গঠনের জন্য তারা এমন প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তারা এমন কারিকুলাম প্রণয়ন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। সেই কারিকুলাম থেকে আমাদের বাংলাদেশও কিন্তু পিছিয়ে নেই! সমকামিতাকে স্বাভাবিককরণ ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তারা সেলিব্রিটিদের দ্বারা নানা ধরনের সিনেমা, নাটক, ওয়েব সিরিজ ছাড়াও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বিশ্ববিখ্যাত সব তারকাদের নিয়ে তারা বড় বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উপস্থাপন করে বিকৃত যৌনাচারের স্থিরচিত্র। আর এই সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার নামক বিকৃত মানসিকতাকে একটি স্টাইল, মডেল হিসেবে উপস্থাপন করছে এবং সেই সাথে তাদেরকে যুবক প্রজন্মের কাছে ভালো ও আকর্ষণীয় করে তুলছে। বিভিন্ন ম্যাগাজিন, বিনোদনমূলক সংবাদ প্রভৃতির মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার, সমকামিতার মত ও পথকে লালন করা তারকাকে বিশ্বে বড় স্টাইলিস, সেলিব্রিটি বানানোর জন্য প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। এজন্যই তো বিটিএস-এর মতো বিকৃত যৌনাচার মানসিক ভারসাম্যহীন দলের সাফাই গাইতে দেখা যায় ইয়াং জেনারেশন ভাই-বোনদের। এমনকি আশ্চর্যের বিষয় হলো— অনেক তরুণ-তরুণী বিটিএস-এর আর্মি বলেও দাবি করে। তাদেরকে অন্ধের মতো ভালোবাসে। তাদের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করলেই তাদের গায়ে আগুন জ্বলে ওঠে। বিশ্বজুড়ে এমন নোংরামি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শুধু বিটিএস-এর মতো সংগঠন নয়; বরং আরো অনেক সংগঠন আছে। এমনকি এমন যৌনাচার, নোংরামিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা বিনামূল্যে কনডম, লুব্রিকেন্ট বিতরণ করতেও পিছিয়ে নেই। সেই সাথে যৌনতাকে নরমালাইজ করার জন্য শিশুদের অবাধ মেলামেশা করার জন্য বৈশ্বিক পরিকল্পনা করছে। যা বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিষয়টি সহজেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশও এক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে। বিশেষ করে বামপন্থি, স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত সুশীল সমাজ বেশি তোড়জোড় করছে। সময়ে সময়ে এরা নড়েচড়ে বসে, কথা বলে, পরিকল্পনা করে। বিশ্ব মোড়লদের এবং জাতিসংঘের বাণীকে এরা মনেপ্রাণে মানে। জাতিসংঘ ও বিশ্ব মোড়ল বলেছে, সমকামী বিয়ে বৈধ। এজন্য জাতিসংঘ-এর প্রতি জনগণের সহনশীলতা পোষণের জন্য পদক্ষেপ নেয় Free and Equal ক্যাম্পেইন। এভাবেই এই বিকৃত, অসভ্য যৌনাচারকে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

[২]

ট্রান্সজেন্ডার হলো সমকালীন বিশ্বের একটি বিষাক্ত ভাইরাস ট্রেনডার। এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে খোদ আমেরিকা, ইউরোপ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে চলছে নানা ধরনের আয়োজন, কার্যক্রম এবং প্রদর্শনী। মূলত ট্রান্সজেন্ডার বলতে সহজ ভাষায় বোঝায়, লিঙ্গ পরিবর্তন তথা কেউ যদি জন্মগতভাবে পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সময় ও যুগের চাহিদায় সে নিজেকে যদি মনে করে সে পুরুষ না বরং সে নারী, তাহলে সে পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে যেই আইডেন্টিফাই পছন্দ করবে সেটাই সে ধারণ করতে পারবে। এখানে মনে রাখবেন যে, এই পরিচয়কে আবার হিজড়া পরিচয়ের সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না। এরা জেন্ডার বৈষম্যকে কেন্দ্র করে একটি বিকৃত, কুরুচি এবং অশ্লীলতাকে ছড়ানোর জন্য এমন নোংরা ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তৈরি করে। তারা হিজড়ার পরিচয়ের দিকে ঝুঁকে না; বরং এর সাথে মিল রেখে মাঝখান থেকে ট্রান্সজেন্ডারকে উদ্ভব করে। যদিও হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বিধান ভিন্ন। ট্রান্সজেন্ডারকে যদিও প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ও একে ধারণ করে পরিচয় দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে সাম্রাজ্যবাদী মহল এবং তারা এটাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিজ্ঞানসম্মত, সহজ, স্বাভাবিক ও জন্মগত বলে প্রচারণা করছে। অথচ সারা দুনিয়ার বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্রে এমন ভূঁইফোড়, নোংরা চিন্তা, মতবাদকে বহু আগেই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। বিজ্ঞান বলেন কিংবা চিকিৎসাবিজ্ঞান সবাই বিনা বাক্যে এটাকে নাকচ করেছে ও করছে। কেননা এটা পরিচয়বিরোধী, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি ধর্মবিরোধী। এমন শ্রেণিবিন্যাসে আল্লাহ তাআলা আশরাফুল মাখলূক্বাত মানুষকে সৃষ্টি করেননি যে, যে ব্যক্তি পুরুষ হয়ে জন্ম নিবে তাকে নারী পরিচয় দিতে হবে কিংবা নারী হয়ে জন্ম নিবে তাকে পুরুষ পরিচয় দিতে হবে! নিঃসন্দেহে এটা একটি হীন, নোংরা ষড়যন্ত্রের নীল নকশা। কেননা যদি এমন পরিচয় দেওয়া হয়, তাহলে সমাজে অবাধ যৌনাচার, সমকামিতা ছড়িয়ে পড়বে। সময়ে সময়ে ব্যক্তির পরিচয়ের পরিবর্তন করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করবে। 'সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ' ক্বায়েম হবে। নিজের স্বভাব, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্রবিরোধী ট্রান্সজেন্ডার এমন চিন্তার ফসল নিয়েই যে আমদানি তা কিন্তু নয়; বরং আরো অনেক চিন্তা-চেতনা সমাজে ছড়িয়ে দিতে চায়। যার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হলো ইসলাম ও মুসলিম। কেননা ইসলামে এরকম নোংরামি ও অশ্লীলতার কোনো সুযোগ নেই। বরঞ্চ এধরনের যত নোংরামি আছে, সে সকলের বিরুদ্ধে ইসলাম অবস্থান সুস্পষ্ট করেছে। ফলে এমন কোনো জানালা নেই, যেটার দ্বারা এমন

মতবাদ উঁকি দিবে আর সেটাই স্বাভাবিককরণ করা যাবে। কেননা ট্রান্সজেন্ডার, সমকামিতা কিংবা পশুকামিতা যাই হোক না কেনো, সর্বধরনের এমন হীন কাজ ইসলামী শরীআতে হারাম এবং মারাত্মক গর্হিত কাজ। ট্রান্সজেন্ডারের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দের মাঝে কোনো রকম পার্থক্য ছাড়াই বুঝাতে চাচ্ছে যে, মূলত ট্রান্সজেন্ডার হলো হিজড়া। সহজ ভাষায় তৃতীয় লিঙ্গ বলতে ট্রান্সজেন্ডার। সত্যি কথা বলতে এরা হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় শব্দের পার্থক্য না করে হিজড়া শব্দকে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য হাছিল করার জন্য ব্যবহার করতে উদগ্রীব। প্রকৃতপক্ষে হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার-এর মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। একটি হলো জেনেটিক সমস্যা আর অপরটি স্বঘোষিত আইডেন্টিফাই। সহজ ভাষায় বলি, হিজড়া হলো একটি জন্মগত জেনেটিক সমস্যা (জন্মগত সমস্যা), যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিতরাতগতভাবে হয়ে থাকে। আর ট্রান্সজেন্ডার হলো, স্বঘোষিত নারী কিংবা পুরুষ বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আইডেন্টিফাই, যা বৃহৎ পরিসরে স্বার্থ হাছিল করার জন্য ব্যবহার করতে চায় এবং পৃথিবীব্যাপী অশ্লীলতা, অন্যায়, সংঘাত ছড়িয়ে দিতে চায়। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে এই ঘৃণিত কাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পায়তারা চালায়। যেমন পাকিস্তানে ট্রান্সজেন্ডার ২০১৮ সালে সংসদে আইন পাশ করা হলে পরবর্তীতে ২০২৩ সালের ১৭ মে আইনটি বাতিল করতে বাধ্য হয়। কারণ হলো, এই মতবাদ যদি এভাবে চালু থাকে, তাহলে তাদের পারিবারিক, সমাজব্যবস্থা টিকে থাকা হুমকির মুখে পড়বে। কেননা ট্রান্সজেন্ডার হলো জন্মগত পরিচয়ের সাথে মনস্তাত্ত্বিক জেন্ডার আইডেন্টিফাইয়ের অনুভূতির মারাত্মক সংঘর্ষ, যা চলমান থাকলে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসবে। ট্রান্সজেন্ডার মানুষের পরিচয়গত বিষয়টিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। একজন মানুষ নিজেকে পুরুষ না নারী বলে পরিচয় দিবে এতেই সে হীনম্মন্যতা, সংকীর্ণতা এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে। প্রশ্ন হলো আপাতত ধরেই নিলাম যে, সে কোনো একটি পরিচয় ধারণ করল। তাহলে পরবর্তী ধাপে তার হুকুম কী হবে? ধরুন, একজন পুরুষ সে ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় গ্রহণ করে, এখন সে নারী বলে পরিচয় দিচ্ছে! এক্ষেত্রে ইসলামী শরীআতে তার বিধান কী হবে? তার ইবাদত, উত্তরাধিকার, বিভিন্ন বিধান কীভাবে বর্তাবে? এমনিভাবে অনেক সমস্যা, জটিলতা ও প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে যার উত্তর তাদের কাছে নেই। এটা তো শরীআতের দৃষ্টিতে বললাম। বাস্তবতার নিরিখে যদি বলা হয়, বাংলাদেশের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা অফিস-আদালত যেটা শুধু নারী কিংবা পুরুষ পরিচালিত সেখানে কি এমন কাউকে নিয়োগ দিবে, যে নিজেকে নারী কিংবা পুরুষ বলে পরিচয় দেয় বা ট্রান্সজেন্ডার-এর ভাষায় নিজেকে আলাদা কিছু দাবি করে তাকে চাকরি কিংবা পড়ালেখার সুযোগ দিবে? নিঃসন্দেহে এটা মানতে চাইবে না। এমনভাবে বাসে, গাড়িতে, বিমানে ছাড়াও যেখানে সেখানে নির্ধারিত নারী আসন কিংবা পুরুষ আসন সুবিধা অর্জনের জন্য যে কেউ এমনটি করতে পারে, যে বলবে, আপাতত আমি নারী বা পুরুষ! এভাবে স্বঘোষিত আইডেন্টিফাই সমাজ ভাঙনের এবং পরিবেশের স্থিতিশীলতা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে এবং দিনে দিনে জটিলতা সৃষ্টি হবে। জটিলতার সমীকরণে সমাজের অশ্লীলতা, যেনা, ব্যভিচার প্রকাশ্যে ছড়ানোর একটি বীভৎস রূপই হলো— ট্রান্সজেন্ডার। একজন মানুষ বাহ্যিকভাবে পুরুষ কিন্তু মনন জগতে সে নিজেকে নারী বলে দাবি করে! কিংবা একজন নারী বাহ্যিকভাবে নারী কিন্তু মনন জগতে সে নিজেকে পুরুষ দাবি করে! তাহলে শারীরিক সম্পর্ক (বৈবাহিক জীবন) কার সাথে করবে? যদি সেই পুরুষ নিজেকে মনন জগতে নারী দাবি করে আর নারী নিজেকে পুরুষ দাবি করে, তাহলে তো প্রকারান্তরে সমকামিতাই হচ্ছে। এমন নোংরামি চিন্তা পাশ্চাত্য সভ্যতা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে গোটা দুনিয়ায়। আমাদের বাংলাদেশও এমন ষড়যন্ত্রের শিকার। বেশ কয়েক বছর থেকে এই মতবাদকে নরমালাইজ করার জন্য অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছে। এটাকে নির্লজ্জভাবে বৈধতার সাফাই কিংবা সহজ, স্বাভাবিক করার জন্য মিডিয়া জোরালো ভূমিকা রাখতে মরিয়া। অনেক নাট্যকার, লেখক, বুদ্ধিজীবীও লজ্জা-শরম বেঁচে খেয়েছে! নইলে এমন কুরুচিপূর্ণ মতবাদকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তার জন্য এত গলাবাজি, সভা, সেমিনার, বিবৃতি দেওয়া যায়? মনে রাখবেন, এটা শুধু একটি মতবাদ নয়, বরং এটা আমাদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নাম। অতএব, এমন কুরুচিপূর্ণ মতবাদকে সমাজজীবন থেকে বিতাড়িত করতে হবে এবং আল্লাহর চিরকল্যাণকর বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে বা যারা এমন অসভ্যতাকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে চায়, তাদের গোঁমর ফাঁস করতে হবে, যা ইতোমধ্যে সবাই জেনেছে। সেই সাথে জনসাধারণকে বুঝাতে হবে এদের বীভৎস ষড়যন্ত্র। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান, আমল বিনষ্টকারী সকল মতবাদ, মিশন, ভিশন থেকে আমাদের নীতি-নৈতিকতাকে পবিত্র রাখার তাওফীক্ব দান করুন এবং আমাদের ইলমী যোগ্যতা দান করুন, যেন ইসলাম ও কুফরের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য করে নব্য জাহেলিয়াতকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে বাতিলকে চূর্ণ করতে পারি- আমীন!

তোমরা রেখো গো স্মরণ, একদিন হবে যে মরণ!

-জাবির হোসেন*

[ক]

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর কবিতায় আমাদের জীবন মৃত্যুর অমোঘ সত্যতা তুলে ধরেছেন। মৃত্যু একটি অবধারিত সত্য। মৃত্যু একটি বাস্তবতা। জন্ম মাত্রই মৃত্যু হবে— এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে মৃত্যুসংক্রান্ত কিছু আয়াত উল্লেখ করি—

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ ‘জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ক্বিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) জান্নাত প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়’ *(আলে ইমরান, ৩/১৮৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ ‘তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই, যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান কর’ *(আন-নিসা, ৪/৭৮)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ ‘বলো, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর, সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে’ *(আল-জুমআ, ৬২/৮)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ‘বলুন, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি তো আমার নিজের জন্য কোনো অপকার ও উপকারের মালিক নই। প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে; যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছে যাবে, তখন তারা মুহূর্তকাল না বিলম্ব করতে পারবে, আর না ত্বরা করতে পারবে’ *(ইউনুস, ১০/৪৯)*।

[খ]

মানব জীবনের সফরসূচি শুরু হয় প্রথমে আল্লাহর নিকট থেকে মায়ের গর্ভে। এটা হলো প্রথম মনযিল। এখানে সাধারণত ৯ মাস ১০ দিন থাকার পর ভূমিষ্ঠ হয়ে সে দুনিয়াতে আসে। এটা হলো দ্বিতীয় মনযিল বা ‘দারুদ দুনিয়া’। এখানে সে কমবেশি ৭০ বছর অবস্থান করে। যা চারটি স্তরে বিভক্ত : (ক) শৈশবের দুর্বলতা (১-১৬ বছর)। (খ) যৌবনের শক্তিমত্তা (১৬-৪০ বছর)। (গ) প্রৌঢ়ত্বের পূর্ণতা (৪০-৬০ বছর) এবং (ঘ) বার্ধক্যের দুর্বলতা (৬০-৭০ বছর)। অতঃপর নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে মৃত্যু ও কবরে গমন। এটা হলো তৃতীয় মনযিল বা ‘দারুল বারযাখ’। এখান থেকে তার আখেরাতের সফর শুরু হয়। যা শেষ হবে ক্বিয়ামতের দিন। কবর তার জন্য জান্নাতের টুকরা হবে বা জাহান্নামের গর্ত হবে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থান শেষে সেখানে মানুষের তিনটি সারি হবে। অগ্রগামী দল, ডাইনের সারি ও বামের সারি। প্রথম দু’টি দল জান্নাতী হবে ও বামের সারি জাহান্নামী হবে। এটি হলো চতুর্থ মনযিল বা ‘দারুল ক্বারার’। যা হলো চূড়ান্ত ঠিকানা।[১]

[গ]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়ে পরীক্ষা করছেন। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। একদিন এই ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষ করে ফিরে যেতে হবে তাঁরই নিকটে। এই দুনিয়ার যিন্দেগী তো ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ‘দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের জীবনই অতি কল্যাণময়, তবুও কি তোমাদের বোধোদয় হবে না?’ *(আল-আন‘আম, ৬/৩২)*। আল্লাহ তাআলা

* এম. এ. (বাংলা), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন [৩০তম পারা], (হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ), পৃ. ৪৪০।

আরও বলেন, ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾ ‘পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা মাত্র। যদি তোমরা বিশ্বাস কর ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন। আর তিনি তোমাদের ধনসম্পদ চান না’ *(মুহাম্মাদ, ৪৭/৩৬)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ‘পার্থিব এ জীবন ক্রীড়াকৌতুক ছাড়া কিছুই নয়, আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, তারা যদি জানত! *(আল-আনকাবূত, ২৯/৬৪)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ ‘হে আমার সম্প্রদায়! পার্থিব এ জীবন (অস্থায়ী) ভোগ্যবস্তু মাত্র, আর আখেরাতই হলো চিরকালীন আবাসস্থল’ *(আল-মুমিন, ৪০/৩৯)*।

[ঘ]

বন্ধু আমার! মানুষ মাত্রই তো মরণ হবে। কিন্তু কে কোথায় মরবে, কখন মরবে, কীভাবে মরবে— তা কী আমাদের জানা আছে? —না, জানা নেই। কারণ এই জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ‘নিশ্চয় আল্লাহর নিকটেই আছে ক্বিয়ামত (সংঘটিত হওয়ার) জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন অঞ্চলে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত’ *(লুক্বমান, ৩১/৩৪)*।

বন্ধু, মরতে তো হবেই একদিন। আজ অথবা কাল। কিন্তু আমরা কি মরণের কথা স্মরণ করব না?

—কেন করব না?

—আমরা কি মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিয়ে সন্দিহান?

—আমরা কি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বকে অস্বীকারকারী?

—না, আমরা তো তা নই।

আমরা মুসলিম। আমরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বিশ্বাস করি। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে স্বীকার করি। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন যে সত্য, তা মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ বোধ করি না। তবু কেন আমরা উদাসীন? কেন আমরা মৃত্যুর কথা স্মরণ করি না? আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ ‘তোমরা বেশি পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারীর অর্থাৎ মৃত্যুর কথা স্মরণ করো’।[২]

বন্ধু, তুমি কি শোনোনি যারা মরণকে বেশি বেশি স্মরণ করে হাদীছে তাদেরকে বুদ্ধিমান বলা হয়েছে। যদি না শুনে থাক তবে হাদীছটি শোনো— ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক আনছারী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তাকে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কে? তিনি বললেন, স্বভাব-চরিত্রে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক উত্তম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই সর্বাধিক বুদ্ধিমান।[৩]

[ঙ]

যখন আমার মৃত্যুর ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন আমি যদি মুমিন হই, আমার মৃত্যুর সময় আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসবেন। যাঁদের চেহারা যেন সূর্যস্বরূপ। তাঁদের সাথে জান্নাতের কাফনসমূহের একটি কাফন (কাপড়) থাকবে এবং জান্নাতের খোশবুসমূহের একরকম খোশবু থাকবে। তাঁরা আমার নিকট হতে দৃষ্টিসীমার দূরে বসবেন। অতঃপর মালাকুল মউত আমার নিকটে আসবেন এবং মাথার নিকটে বসে বলবেন, হে পবিত্র রূহ (আত্মা)! বের হয়ে এসো আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে।

তখন আমার রূহ সেই রকম (সহজে) বের হয়ে আসবে, যে রকম (সহজে) মশক হতে পানি বের হয়ে আসে। তখন

২. তিরমিযী, হা/২৩০৭, হাসান।
৩. ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫৯, হাসান।

মালাকুল মউত তা গ্রহণ করবেন এবং এক মুহূর্তের জন্য নিজের হাতে না রেখে বরং ওই সকল অপেক্ষমাণ ফেরেশতাদের হাতে দিয়ে দেবেন। তাঁরা ওই কাফন ও ওই খোশবুতে রাখবেন। তখন তা হতে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু অপেক্ষা উত্তম মিশকের খোশবু বের হতে থাকবে।

তা নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকবেন এবং যখনই তাঁরা ফেরেশতাদের মধ্যে কোনো ফেরেশতা দলের নিকট পৌঁছবেন, তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন, এই পবিত্র রূহ (আত্মা) কার? তখন তাঁরা দুনিয়াতে আমাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তম উপাধি দ্বারা ভূষিত করে বলবেন, এটা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ।

যতক্ষণ তাঁরা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছবেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকবে) অতঃপর তাঁরা আসমানের দরজা খুলতে চাইলে অমনি তাঁদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাঁদের পশ্চাদগামী হবেন তার উপরের আসমান পর্যন্ত। এভাবে তাঁরা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছবেন।

এ সময় আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার বান্দার ঠিকানা ‘ইল্লিঈন’-এ লিখো এবং তাঁকে (তাঁর কবরে) যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছি এবং যমীনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব। অতঃপর যমীন হতে আমি তাদেরকে পুনরায় বের করব (হাশরের মাঠে)। সুতরাং আমার রূহ আমার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

আর আমি যদি অবিশ্বাসী হই, তাহলে আসমান হতে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হবেন। যাদের সাথে শক্ত চট থাকে। তাঁরা আমার নিকট হতে দৃষ্টিসীমার দূরে বসবেন। অতঃপর মালাকুল মউত আসবেন এবং মাথার নিকটে বসবেন। তারপর বলবেন, হে খবীস রূহ (আত্মা)! বের হয়ে আয় আল্লাহর রোষের দিকে।

এ সময় রূহ ভয়ে আমার শরীরে এদিক-সেদিক পালাতে থাকবে। তখন মালাকুল মউত তাকে এমনভাবে টেনে বের করবেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজে পশম হতে টেনে বের করা হয় (আর তাতে পশম লেগে থাকে)। তখন তিনি তা গ্রহণ করে মুহূর্তকালের জন্যও নিজের হাতে রাখবেন না। বরং তা অপেক্ষমাণ ফেরেশতাগণ তাড়াতাড়ি সেই আত্মাকে দুর্গন্ধময় চটে জড়িয়ে নেবেন। তখন তা হতে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকবে, যা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা বেশি।

তা নিয়ে তাঁরা উপরে উঠতে থাকবেন। কিন্তু যখনই তাঁরা তা নিয়ে ফেরেশতাদের কোনো দলের নিকট পৌঁছবেন, তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন, এই খবীস রূহ কার? তখন তাঁরা আমাকে দুনিয়াতে যে সকল মন্দ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হতো, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ নামটি দ্বারা ভূষিত করে বলবেন, অমুকের পুত্র অমুকের।

এভাবে আমার রূহ প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর আমার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হবে, কিন্তু খুলে দেওয়া হবে না।

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার ঠিকানা ‘সিজ্জীন’-এ লিখো, যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে। সুতরাং আমার রূহকে যমীনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হবে।[৪]

(ইনশা-আল্লাহ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

৪. আব্দুল হামীদ মাদানী, মরণকে স্মরণ (তাওহীদ প্রকাশনী- বর্ধমান), পৃ. ৮৯-৯৩।

জেরুযালেম ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

(পর্ব-৬)

জেরুযালেম বিজয়ে সংঘটিত অন্যান্য যুদ্ধ: রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বে রোমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য তিনি আরেকটি বাহিনী তৈরি করেছিলেন, যেই বাহিনীর দায়িত্বভার দিয়েছিলেন মুতার যুদ্ধে নিহত সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেছা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সন্তান ১৬/১৭ বছরের যুবক ও কিশোর উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে, যাতে উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতার হত্যাকারী রোমানদের থেকে যথোপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারেন। এই বাহিনী রওয়ানা দিয়ে মদীনা অতিক্রম করার পর রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করা মাত্রই সারা আরবে ফেতনা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ মুরতাদ হয়ে যায়, কেউ যাকাত দিতে চায় না, মিথ্যুক নবুঅতের দাবিদারদের আবির্ভাব ঘটে। তখন আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সব ছাহাবী পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে, এখন যত সেনাবাহিনী আছে সবাইকে মদীনাতে থাকা উচিত। মুহাম্মাদ ﷺ-এর মৃত্যুর খবর শুনে আমাদেরকে দুর্বল ভেবে শত্রুরা মদীনায় আক্রমণ করতে পারে। অতএব, উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনীকেও মদীনায় রেখে দেওয়া উচিত। উত্তরে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَوْ جَرَتِ الْكِلَابُ بِأَرْجُلِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَدَدْتُ جَيْشًا وَجَّهَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا حَلَلْتُ لِوَاءً عَقَدَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘যদি উম্মাহাতুল মুমিনীনের পা কুকুর-শিয়াল টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায়, তবুও আমি (আবূ বকর) ঐ সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে নিব না, যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠিয়েছিলেন। আর সেই ঝান্ডা খুলে নিব না, যাকে রাসূল ﷺ উত্তোলন করেছিলেন’।[১]

যদিও পরবর্তীতে অভ্যন্তরীণ ফেতনা তীব্র আকার ধারণ করার কারণে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালু রাখা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ এক বছর যাবৎ আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে, মিথ্যা নবুঅতের দাবিদারদের বিরুদ্ধে, যাকাত আদায় অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। অভ্যন্তরীণ সকল ফেতনাকে পায়ের নিচে ধ্বংস করে দিয়ে তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেন। এক ভাগ খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে চলে যান পারস্য বিজয় করার জন্য। আরেক ভাগকে তিনি চার ভাগে ভাগ করে দেন, যাদেরকে তিনি পাঠান শাম, ফিলিস্তীন বা বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় করার জন্য। বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ের পথে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবদ্দশায় প্রথম যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেটা হচ্ছে আজনাদাইনের যুদ্ধ। আজনাদাইনের এই যুদ্ধ হচ্ছে সর্বপ্রথম আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফত আমলে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে বিজয় করার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ আরও বহু ছাহাবী অংশগ্রহণ করেছেন। ‘আজনাদাইন’ হচ্ছে বর্তমান ফিলিস্তীনের রামাল্লা থেকে মাত্র ৩০/৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে। এই যুদ্ধে খালেদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুজাহিদদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, اعلموا إنكم لستم ترون للروم جيشا مثل هذا اليوم فإن هزمهم الله على أيديكم فما يقوم لهم بعدها قائمة أبدا فأصدقوا في الجهاد وعليكم بنصر دينكم وإياكم أن تولوا الأدبار فيعقبكم ذلك دخول النار ‘হে মুসলমানগণ! তোমরা রোমানদেরকে এত বেশি সংখ্যায় অতীতে কখনোই দেখোনি। আজকে যদি মহান আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেকে পরাজিত করে তাহলে এই দেশে আর তারা কখনোই টিকে থাকতে পারবে না। অতএব তোমরা অন্তর থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও! আর তোমাদের জন্য জরুরী তোমাদের দ্বীনকে সহযোগিতা করা। আর অবশ্যই তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নামে দিয়ে দিবেন’।[২]

আজনাদাইনের যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয় লাভ করলেও সরাসরি জেরুযালেমে তারা প্রবেশ করতে পারেনি। আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর পরে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ক্ষমতার দায়িত্বভার গ্রহণ করা মাত্রই তিনি খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করেন। এটা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফত আমলের এক ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত ছিল। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিহাসের পাতায় আলোচনা-সমালোচনা কম হয়নি। তবে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিজস্ব কিছু বর্ণনা সকল সমালোচনার জবাব হিসেবে যথেষ্ট।

ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৩০৫।

২. ফুতূহ আশ-শাম, ১/৪৪-৫০।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, إِنِّي لَمْ أَعْزِلْ خَالِدًا عَنْ سَخْطَةٍ وَلا خِيَانَةٍ، وَلَكِنَّ النَّاسَ فُتِنُوا بِهِ، فَخِفْتُ أَنْ يوكلوا إِلَيْهِ وَيُبْتَلُوا بِهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الصَّانِعُ ‘আমি ক্রোধের কারণে বা কোনো ধরনের খিয়ানতের কারণে খালেদকে অপসারণ করিনি। কিন্তু মানুষ তার কারণে ফেতনায় পড়ে গেছে (মানুষ মনে করে বসছে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ থাকলেই যুদ্ধে বিজয় হয় আর খালেদ ইবনে ওয়ালীদ না থাকলে যুদ্ধে বিজয় হবে না। আমি মানুষের এই আক্বীদাকে নষ্ট করার জন্য খালেদ বিন ওয়ালীদকে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করেছি)। আমি আশঙ্কা করছি যে, মানুষ তার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য আমি চেয়েছি যে, যাতে মানুষ বুঝে যে, বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, কোনো ব্যক্তির কারণে নয়’।[৩]

আর ঠিকই খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অপসারণের পরে যখন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হলো, তখন তার নেতৃত্বে বায়সানের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এই যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয় লাভ করেছিলেন। আর এই যুদ্ধে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন সাধারণ সেনা হিসেবে আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অধীনে সেদিন যুদ্ধ করেছিলেন।

বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড় যুদ্ধ:

বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ে সর্বশেষ, সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ হচ্ছে ইয়ারমূকের যুদ্ধ। আজনাদাইন এবং বায়সানের যুদ্ধে অব্যাহত পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তুরস্ক সীমান্তবর্তী আন্তাকিয়া থেকে রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস আড়াই লক্ষ সেনাবাহিনীর বিশাল বহর নিয়ে রওয়ানা দিলেন মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য।

অন্যদিকে মুসলিমদের ছিল মাত্র ৩০ হাজার মুজাহিদ। আর মুসলিমদের প্রধান সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ২ লক্ষের অধিক বিশাল রোমান সেনাবাহিনী দেখে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে চিঠি লিখলেন,

فالعَجَلَ وقد سار القوم إلينا كالجراد المنتشر ونحن على نية الحرب والقتال فلا تغفل عن المسلمين وأمدنا برجال من الموحدين.

হে আমীরুল মুমিনীন! রোমানরা পঙ্গপালের মতো আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আর আমরা যুদ্ধ ও কিতালের নিয়্যত করেছি। তবে আপনি মুসলিমদের থেকে গাফেল হবেন না এবং আমাদেরকে তাওহীদপন্থি আরো কিছু যোদ্ধা দিয়ে সহযোগিতা করুন![৪]

উত্তরে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু লিখে পাঠালেন, فإن نصر الله خير لكم من معونتنا واعلموا إنه ليس بالجمع الكثير يهزم الجمع القليل وإنما يهزم الجمع القليل وإنما يهزم بما أنزل الله من النصر وأن الله عز وجل يقول ﴿وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١٩] وما النصر إلا من عند الله ‘নিশ্চয় মহান আল্লাহর সাহায্য তোমাদের জন্য উত্তম হবে আমাদের সহযোগিতার চেয়ে। আর তোমরা জেনে রাখো! কখনোই কোনো বড় দল কোনো ছোট দলকে পরাজিত করতে পারে না; বরং অনেক ছোট দলই বড় দলকে পরাজিত করে যদি তাদের সাথে মহান আল্লাহর সাহায্য থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, “আর তাদের সংখ্যাধিক্য তোমার কিছুই করতে পারবে না। নিশ্চয় মহান আল্লাহ মুমিনদের সাথে রয়েছেন” *(আল-আনফাল, ৮/১৯)*। আর সহযোগিতার মূল মালিক মূলত আল্লাহ তাআলা’।[৫]

তারপর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি আয়াত লিখলেন, قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ‘আর যারা মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তারা বলে, কত অল্প সংখ্যক দল কত বেশি সংখ্যক দলের উপর বিজয় লাভ করেছে মহান আল্লাহর ইচ্ছায়। আর নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ছবরকারীদের সাথে আছেন’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৪৯)*।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পাল্টা চিঠি পেয়ে আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে পরামর্শ করলেন। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সরাসরি আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রস্তাব দিলেন, শুনুন! আমি যেটা বলব, আপনি কি সেটা মানবেন? তখন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ! আপনি যেটা বলবেন আমি সেটা মানব। তখন খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আজকের জন্য আপনি দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু একমত হলেন এবং খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উপর যুদ্ধের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।

এই যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছিলেন আমর ইবনুল ‘আছ, মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান, আবূ হুরায়রা, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ এবং মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

সেদিন ইয়ারমূকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ের সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই ইয়ারমূকের জায়গা চয়ন করেছিলেন। যেটা ছিল তিন দিক থেকে উঁচু পাহাড়ঘেরা মরুভূমির উপত্যকা। তার পরিকল্পনা ছিল রোমানদের বিশাল ২ লক্ষ সেনাবাহিনীকে ঐ উপত্যকায় আটকিয়ে দেওয়া এবং আশেপাশের পাহাড় থেকে যাতে যুদ্ধ করতে সহজ হয়। ছয় দিনব্যাপী ইয়ারমূকের যুদ্ধ চলমান

৩. তারীখ ত্বাবারী, ৪/৬৮।
৪. ফুতূহ আশ-শাম, ১/১৬৭।
৫. প্রাগুক্ত।

থাকে। শুরুর দিকে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রক্ষণাত্মকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। শেষদিন তিনি মুসলিমদের উজ্জীবিত করে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এত লম্বা সময় যুদ্ধ চলমান থাকার পর এমন আক্রমণাত্মক কোনো সিদ্ধান্ত মুসলিমরা নিবে তা রোমানদের কল্পনাতেও ছিল না। ফলত, তারা ধীরে ধীরে পরাজিত হতে থাকে। মুসলিমরা বিজয় লাভ করে। আর এটাই ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ের সর্বশেষ যুদ্ধ।

জেরুযালেম বিজয়ে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু): এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের মাধ্যমে পুনরায় মুসলিমরা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে বিজয় অভিযান পরিচালনা শুরু করেন। একদল জর্ডান বিজয়ের জন্য বের হয়ে যান, আরেকদল দামেস্ক বিজয়ের জন্য বের হয়ে যান। আর আমর ইবনুল 'আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে তৃতীয় একটি দল ফিলিস্তীনের গাযা, ইয়াফা, হায়ফা, তেলআবীব এই অঞ্চলগুলো বিজয়ের জন্য বের হয়ে যান। আমর ইবনুল 'আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বায়তুল মুক্বাদ্দাসের চার দিক থেকে সকল শহর, সকল এলাকা বিজয় করে ফেলেন, শুধু বাকি থাকে জেরুযালেম। জেরুযালেম তখন ছিল রোমানদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ, সবচেয়ে বড় কেন্দ্রস্থল। জেরুযালেমের নিকটে গিয়ে তিনি চিঠি লিখে পাঠালেন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকটে। জেরুযালেম একাই আমার পক্ষে বিজয় লাভ করা সম্ভব নয়, আপনিও আসুন। তখন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরো তিন দিকে যারা যুদ্ধ করছিলেন, তাদেরকেও জেরুযালেমে ডেকে পাঠালেন। সেনাবাহিনীর চারটি দল পুনরায় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের চারপাশে একত্রিত হলেন। সেদিন জেরুযালেমে প্রায় ৪ হাজার ছাহাবী একত্রিত হয়েছিলেন। মুসলিমরা জেরুযালেম অবরুদ্ধ করে ফেলেন। যখন প্রধান সেনাপতি আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জেরুযালেম এসে পৌঁছেন, তখন মুসলিমরা তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানান। তাকবীর ধ্বনিতে ভেতর থেকে পাদ্রী বের হয়ে আসে। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখে সে তার হাতে থাকা তাওরাত বা ইঞ্জীলের সাথে মিলিয়ে দেখে যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাস যার বিজয় করার কথা এই ব্যক্তি সেই ব্যক্তি নন। তখন আবার সে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের ভেতরে ফিরে গিয়ে অন্য পাদ্রীদের বলে, তোমরা শান্ত থাকো, যার হাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় হওয়ার কথা সে এখনো আসেনি; অতএব কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু খাদ্যের সংকটের কারণে, পানির সংকটের কারণে কিছুদিন পর পাদ্রীরা আবার বের হয়ে এসে মুসলিমদের সাথে কথা বলতে চায়। কথা বলতে বলতে মদীনায় থাকা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বৈশিষ্ট্যের আলোচনা আসে। যখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বৈশিষ্ট্য পাদ্রী শুনে, তখন পাদ্রী বলে, হ্যাঁ, এই তো সেই ব্যক্তি, যার হাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় হবে। আমাদের কিতাবে লেখা আছে।

'এক শর্তে আমরা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের চাবি তোমাদের হাতে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে স্বয়ং উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে উপস্থিত হতে হবে'।[৬]

আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চিঠি লিখে পাঠালেন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্দেশ্যে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পাল্টা চিঠিতে জানালেন যে, আমি আসছি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উদ্দেশ্যে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অর্ধপৃথিবীর খলীফা হওয়ার পরও মদীনা থেকে মাত্র একটা উট আর তার সাথে একজন গোলাম নিয়ে রওয়ানা হলেন, তার পরনে ছিল তালি লাগানো ছেঁড়া-ফাটা জামা। আর গোলামের সাথে তার চুক্তি ছিল এই লম্বা (১২০০ কিলোমিটার) রাস্তায় অর্ধেক রাস্তা আমি উটের পিঠে থাকব, তুমি রশি ধরে টানবে আর অর্ধেক রাস্তা তুমি উটের পিঠে থাকবে, আমি রশি ধরে টানব। যেই মুহূর্তে জেরুযালেমের দামেস্ক গেট-এর নিকটবর্তী চলে আসেন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), তখন তার পালা ছিল উটের রশি ধরে টানা আর উটের উপরে বসে ছিল গোলাম। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হন্তদন্ত হয়ে কাছে গিয়ে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا، تَخْلَعُ خُفَّيْكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى عَاتِقِكَ، وَتَأْخُذُ بِزِمَامِ نَاقَتِكَ، وَتَخُوضُ بِهَا الْمَخَاضَةَ؟ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَوَّهْ لَمْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نَكَالًا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ» 'হে আমীরুল মুমিনীন আপনি আপনার জুতা খুলে কাঁধে নিয়ে, উটের রশি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি খুশি হবেন না যে, আপনাকে দেখে মুসলিমরা গর্ববোধ করুক! তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আবূ উবায়দা যদি তুমি না হয়ে অন্য কেউ এই কথা বলত। জেনে রাখো, হে আবূ উবায়দা! নিশ্চয় আমরা অপমানিত জাতি ছিলাম। আজ মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আমরা ইসলাম ব্যাতীত অন্য আর যেখানেই সম্মান খুঁজি না কেন মহান আল্লাহ আমাদেরকে পুনরায় অপমানিত করে দিবেন'।[৭]

জেরুযালেম বিজয়ের পর পাদ্রীদের সাথে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন। সেই চুক্তিনামাটি ফিলিস্তীনের কিয়ামা কানীসা বা কিয়ামা গির্জায় এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। চুক্তিটি নিম্নরূপ:

৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬৫৬।
৭. মুসতাদরাকে হাকেম, হা/২০৭।

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أعطى عبد الله، عمر، أمير المؤمنين، أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها وبريئها وسائر ملتها. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينقص منها ولا من حيّزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يضارّ أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن. وعليهم أن يُخرِجوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا أمنهم. ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِيَعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بِيَعهم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم. ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.

كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرية.

شهد على ذلك: خالد بن الوليد، وعبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان.

সারমর্ম: এটি আল্লাহর বান্দা উমার-এর পক্ষ থেকে (আহলে ঈলিয়া) বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অধিবাসীকে প্রদত্ত নিরাপত্তা। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খ্রিষ্টান যত অধিবাসী আছে, সকলের জানমাল নিরাপদ। ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য জবরদস্তি করা হবে না। জেরুযালেমের অধিবাসীদেরকে মাদায়িনের অধিবাসীদের মতো জিযিয়া প্রদান করতে হবে। যারা জেরুযালেম থেকে বের হয়ে রোম বা অন্য কোথাও ফেরত যেতে চায়, তাদের জন্যও পরিপূর্ণ নিরাপত্তা থাকবে। আর জেরুযালেমে খ্রিষ্টানদের সাথে কোনো ইয়াহূদী বসবাস করতে পারবে না। আর এই চুক্তিটি রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম শাসক ও প্রত্যেক মুমিনের উপর জরুরী কর্তব্য। এটি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে ওয়াদা।[৮]

উক্ত চুক্তিতে ইয়াহূদীদের বসবাস না করার বিষয়টি মূলত খ্রিষ্টান পাদ্রীদের চাপাচাপিতে যুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর হত্যাকারী হিসেবে ইয়াহূদীদেরকে দায়ী করত। তাই তারা কখনোই চাইত না ইয়াহূদীদের দ্বারা তাদের পবিত্র ভূমি নাপাক হোক। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই চুক্তি উমাইয়া, আব্বাসীয়, মামলূক থেকে শুরু করে উছমানীয় খেলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত মুসলিমরা লঙ্ঘন করেনি। কোনোদিন জেরুযালেমে বসবাসরত কোনো খ্রিষ্টানের সাথে তারা খারাপ আচরণ করেনি। কোনো গির্জায় আক্রমণ করা হয়নি। কোনো গির্জাকে নষ্ট করা হয়নি। অথচ আজকের খ্রিষ্টানরা তথা আমেরিকা ও ইউরোপ উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে করা চুক্তিভঙ্গ করেছে। আজকে তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ইয়াহূদীদেরকে বসবাস করতে দিচ্ছে।

যাহোক, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু চুক্তি সম্পন্ন করার পর পাদ্রীর নিকট ছালাত আদায় করতে চাইলেন। পাদ্রী তাকে গির্জায় নিয়ে গেলেন। গির্জায় ঢুকার পর পাদ্রী উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলল, আপনি এখানে ছালাত আদায় করুন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে ছালাত আদায় করতে চাইলেন না। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি আমাকে মাসজিদুল আক্বছায় নিয়ে চলুন। পাদ্রী বলল, আপনি কি ওই জায়গা খুঁজছেন, যেই জায়গাকে ইয়াহূদীরা সবচেয়ে বেশি সম্মান করে? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি ঐ জায়গা খুঁজছি, যেটাকে ইয়াহূদীরা সবচেয়ে বেশি সম্মান করে। তখন পাদ্রী তাকে এক বিশাল উঁচু জায়গায় নিয়ে গেলেন। জায়গাটিতে বড় বড় পাথর রাখা, অপরিচ্ছন্ন, অপরিষ্কার অবস্থায় পড়ে আছে। তখন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পরিষ্কার করা শুরু করলেন। তার সাথে ছাহাবীগণও হাত লাগিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পরিষ্কার করা শুরু করলেন। তখন কা'ব আল-আহবারকে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! কোথায় মসজিদ তৈরি করব আমরা? কা'ব আল-আহবার বললেন, এই পাথরকে ইয়াহূদীরা সবচেয়ে বেশি সম্মান করে, ইয়াহূদীরা ক্বেবলা হিসেবে ব্যবহার করে। আপনি এই পাথরের পেছনে মসজিদ তৈরি করুন। তখন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কী বলো? এই পাথরের পিছনে মসজিদ তৈরি করলে তো ইয়াহূদীরা বলবে যে, মুসলিমরা এই পাথরকে সিজদা করছে। না! এই পাথরের পিছনে মসজিদ তৈরি করা যাবে না। তিনি পাথরের সামনে এগিয়ে গিয়ে একদম শেষ মাথায় মসজিদ তৈরি করলেন। বর্তমান যে আল-আক্বছা মসজিদ কম্পাউন্ড দেখা যায় তার পুরো উঁচু এরিয়াটাই মূলত পবিত্র ভূমি। সেই উঁচু এরিয়ার সম্পূর্ণ ক্বেবলা বা কা'বার দিকে যে চত্বর, সেখানেই মসজিদ তৈরি করেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, যা বর্তমানে কিবলী মসজিদ নামে পরিচিত। সেটিই মূলত প্রকৃত মসজিদে আক্বছা। আর বর্তমানে যেটি কুব্বাতুছ ছখরা (স্বর্ণালি গম্বুজ) দেখা যায়। সেই কুব্বাতুছ ছখরার নিচেই রয়েছে ইয়াহূদীদের সেই পবিত্র পাথর।

মসজিদে আক্বছায় বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আযান দিলেন এবং উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ফজরের ছালাতে ইমামতি করলেন। এভাবেই জেরুযালেম ও মসজিদে আক্বছা মুসলিমদের অধীনে চলে আসে। ফালিল্লাহিল হামদ!

(চলবে)

৮. তারীখ ত্বাবারী, ৩/৬০৯।

www.al-itisam.com

সত্য

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
মুহিমনগর, চৈতনাখিলা, শেরপুর।

সত্য হলো জান্নাতী পথ নবীর বাণী বলে
আপদ-বিপদ মুক্ত জীবন সঠিকভাবে চলে।
ঝুটঝামেলা নেই কোনোখান সত্যবাদী জানে
সত্য পথে চলতে কারো কঠিন বাঁধা হানে।
সত্য হলো সকাল বেলার সূর্য উঠার মতো
এ পথে লোক কমই থাকে, পাওয়া যায় না তত।
চলাফেরা বড়ই কঠিন— সত্য বলে কথা...
মিথ্যা নিয়ে পড়ে থাকে দারুণ অলসতা।
সত্য হলো উচিত কথা মুখে পড়ে কালি
যদিও লোক এ পথে কম তবু বাজে তালি।
সমাজ গড়লে সত্য দিয়ে সবাই হবে দামি
মিথ্যা জেনেও চলি ওপথ, একটু নাহি থামি।
সত্য নিয়ে চলতে যদি আমরা সবাই পারি
ঝর্ণাধারার জান্নাতে ওই, সবার হবে বাড়ি।

মা তুমি!

-আব্দুল ওয়াদুদ বিন আবূ বকর
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

মাগো তুমি এই ভূবনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামত,
তাইতো তুমি শিশুকালে করেছ যে কত মেহনত।
শৈশবে কত কষ্ট দিয়েছি তোমায় মা,
তবুও কোলে তুলে নিয়েছ তুমি বলে বাবা।
মাগো তুমি আমার জন্য এ জীবনে করছ যা,
জীবন দিয়েও শোধ হবে না মাগো তা।
মাগো তুমি এই ধরাতে সফলতার চাবি,
তাইতো মাগো তোমার কাছে করি সব দাবি।
দুঃখভারাক্রান্তে বলি ওগো আমার মা,
ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিয়ো মোরে কষ্ট দিয়েছি যা।
তোমার কাছে নাকি মাগো সব দু'আ সম্ভার,
তাই খুলে রাখলাম মাগো, মোর জীবনের অন্তর।
মাগো তুমি সবচেয়ে আপন দয়ার সুরের বাসি,
কী করে দেখাবো মাগো, তোমায় যে কত ভালোবাসি।

ঈদের সুর

-রমজান বিন শামসুল
খাগুরিয়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

এক চন্দ্রবর্ষ পরে
এলো স্বপ্নের ধার,
এক মাস রামাযানের তরে
এলো উৎসবের পার।
মন মিতালির তালে
হব আনন্দে মুখর,
মহান আল্লাহর করব যিকির
আরও করব শুকর।
ঈদের খুশির বার্তা নিয়ে
নগরের মানুষ গ্রামে আসে,
পরিবার-পরিজনের সাথে
মেতে থাকে উল্লাসে।
মিসওয়াক ও গোসল দিয়ে
উত্তম কাপড় পরে,
বিজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে
মাঠে যাব তাকবীর পড়ে।
সবাই মিলে আদায় করব
খোলা মাঠে ছালাত,
ফিরতি পথে বন্ধুবান্ধবে
করব মোলাকাত।

আসছে ঈদ

-আশরাফুল হক
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ক'দিন পরে সবার ঘরে
বাজবে খুশির বীণ,
বলবে সবাই মাঠে চলো ভাই
আজকে ঈদের দিন।
ঈদের ছালাত পড়ে সবাই
করবে মোলাকাত,
আমার বাড়ি রইল দাওয়াত
বলবে সালামাত।

বাংলাদেশ সংবাদ

বিতর্কিত জাতীয় পাঠ্যক্রম: প্রজন্মের প্রকৃত শিক্ষা ভাবনা

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার- ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদ আয়োজিত 'বিতর্কিত জাতীয় পাঠ্যক্রম: প্রজন্মের প্রকৃত শিক্ষা ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে দেশের বিভিন্ন ঘরনার উলামায়ে কেরাম বক্তব্য রাখেন। আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক সেমিনারে মুসলিম অধঃপতনের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি উছমানী খেলাফতের পতন ও ফিলিস্তীনে ইসরাঈল সৃষ্টির পেছনে ইয়াহূদীদের লবিং ও মুসলিমদের অদূরদর্শিতাকে দায়ী করেন। নতুন সিলেবাসে হিন্দুত্ববাদ ও পশ্চিমা চিন্তার প্রভাব একদিনে তৈরি হয়নি বলে মন্তব্য করেন। এক্ষেত্রে আলেম-উলামাকে তৎক্ষণাৎ রি-এক্ট না করে এক্ট তথা রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারক পর্যায়ে লবিং করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মুসলিম উম্মাহর পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষায় পশ্চাদপদতা, চারিত্রিক অবক্ষয়, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও আমানতদারিতার অভাবকে দায়ী করেন। তিনি ছাহাবায়ে কেরামের জীবনকে অনুসরণীয় বলে উল্লেখ করেন এবং সেই সোনালি যুগে মানুষদের ফিরে যেতে উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি সারা দেশে মসজিদভিত্তিক মক্তবকে দ্বীন শিক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি শিক্ষার সকল স্তরে কুরআনী শিক্ষা ও রাসূল ﷺ-এর সীরাতকে জাতীয় শিক্ষা ও কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানান।

শিক্ষামন্ত্রীর উদ্বেগ: যত্রতত্র মাদরাসা হওয়ার কারণে স্কুলে শিক্ষার্থী কমছে

গত ৩রা মার্চ, রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের প্রথম দিনের তৃতীয় অধিবেশনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্য অধিবেশন শেষে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল সাংবাদিকদের বলেন, সারা দেশে যত্রতত্র ক্বওমী-নূরানী মাদরাসা বাড়ছে। এতে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমছে। এটি সবার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ, যে কারণে এটি নিরসন করতে হবে। মন্ত্রী বলেন, অনিবন্ধিত মাদরাসাগুলোর বিষয়ে ডিসিদের পক্ষ থেকে আলোচনা উঠে এসেছে। বিশেষ করে তারা বলেছেন, সারা দেশে যত্রতত্র নূরানী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসকদের আশ্বস্ত করেছি, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের নিবন্ধিত হওয়ার প্রক্রিয়ার বাইরে যারা মাদরাসা খুলছেন, সেগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত নয়। সেক্ষেত্রে কীভাবে বেফাক তাদের ছয়টি বোর্ডের মাধ্যমে নিবন্ধন দিচ্ছে, তাদের সাথে কাজ করতে হবে। একটি বয়সসীমা পর্যন্ত সেখানে যাতে জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়। নয়তো শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না। তিনি বলেন, কখন শিক্ষার্থীরা স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়, সেই সময়টাতে এসব (অনিবন্ধিত মাদরাসা) প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা যায় কি-না, সেগুলো নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করব। তবে অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর হার বাড়বে, আর নিবন্ধিত ও সরকারের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী কমবে, এটা কখনোই করতে দেওয়া যাবে না।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

ফিলিস্তীনের প্রতি সংহতি, ইসরাঈলী পণ্যমুক্ত অঞ্চল ঘোষণা বেলফাস্টে

উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজধানী বেলফাস্টের কয়েকটি এলাকাকে 'ইসরাঈলী পণ্যমুক্ত অঞ্চল' ঘোষণা করে ফিলিস্তীনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে স্থানীয় সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান সংগঠন লাসাইর ডের্গ। সংগঠনটি জানায়, 'আমরা বেলফাস্টের বেশকিছু এলাকাকে ইসরাঈলী পণ্যমুক্ত অঞ্চল ঘোষণা করেছি। ফলে এসব এলাকায় ইসরাঈলী পণ্য মজুদ বা বিক্রি করা হবে না। স্থানীয় ক্ষুদ্র দোকান থেকে শুরু করে বড় বড় সুপারমলেও এ কার্যক্রম চলবে। বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচারের প্রতি স্থানীয় প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে আমরা বিষয়টির ওপর কড়া নজর রাখব'। উত্তর আয়ারল্যান্ডের এ সংগঠনটি জানায়, ফিলিস্তীনে ইসরাঈল যে ইচ্ছাকৃত গণহত্যা ও জাতিগত নির্মূলে অভিযান চালাচ্ছে, আমাদের এ কার্যক্রম তার সরাসরি প্রতিক্রিয়া। ভবিষ্যতে ইসরাঈলী পণ্য বয়কটে আরও বেশি কাজ করা হবে বলে জানায় লাসাইর ডের্গ। সংগঠনটির এক মুখপাত্র জানান, 'এটি কোনো রাজনৈতিক বিবৃতি নয়, বরং এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ও স্বাধীনতার জন্য ফিলিস্তীনিদের লড়াইকে সমর্থন করার চেষ্টা'। বেলফাস্টের একজন ব্যবসায়ী বিষয়টিকে ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেন। বৃহত্তর একটি সংগ্রামের অংশ হতে পেরে নিজেকে গর্বিত দাবি করে তিনি বলেন, 'কোনো নৈতিক ইস্যুতে আমাদের সম্প্রদায়কে এভাবে একত্রিত দেখতে পাওয়া বেশ অনুপ্রেরণাদায়ক'। লাসাইর ডের্গ জানায়, আরও অনেক এলাকাকে 'ইসরাঈলী পণ্যমুক্ত অঞ্চল' ঘোষণা করতে কাজ চলছে। সংগঠনটি আরও জানায়, 'এটি কেবল ফিলিস্তীনের জন্যই

নয়, বরং পুরো বিশ্বে যারা নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তাদের জন্য একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে'।

ভারতের রাজস্থানের স্কুলে সূর্য প্রণাম, মুসলিম শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে নিষেধ উলামায়ে হিন্দের

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজস্থান শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে 'প্রত্যেক স্কুলে সূর্য নমস্কার বাধ্যতামূলক' নির্দেশ জারি করা হয়। সরকারি, বেসরকারি সব স্কুলের শিক্ষার্থীদেরই ক্ষেত্রে একই বিধান বলবৎ। স্কুলে প্রার্থনার সময় শিক্ষার্থীরা ১৫ মিনিট করে সূর্যপ্রণামের অনুশীলন করবে। সূর্যের পূজা করা 'ইসলামে নিষিদ্ধ' হওয়ায় স্কুলে সূর্য নমস্কার করানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় আদালতের দ্বারস্থ হন জমিয়ত-উলামায়ে-হিন্দ। তারা রাজ্যের সমস্ত মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য মসজিদগুলোকে বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের কথা জানান।

মুসলিম বিশ্ব

গাযায় নিহত শিশু-নারীর সংখ্যা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ৬ গুণ

গাযায় ইসরাঈলী হামলায় ১২ হাজার ৬৬০ শিশু ও ৮ হাজার ৫৭০ জন নারী নিহত হয়েছেন। যা সম্মিলিতভাবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিহত নারী ও শিশুর সংখ্যার চেয়ে অন্তত ৬ গুণ। তুরস্কের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। গাযা প্রশাসনের বরাত দিয়ে আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের ৭ অক্টোবর গাযায় ইসরাঈলী হামলার পর থেকে এখন পর্যন্ত ফিলিস্তীনি ভূখণ্ডটিতে ২৯ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তীনি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ১২ হাজার ৬৬০ শিশু ও ৮ হাজার ৫৭০ জনই নারী। এই সময়ে আহত হয়েছে আরও অন্তত সাড়ে ৬৯ হাজার ফিলিস্তীনি। যাদের ৭০ শতাংশেরও বেশি শিশু ও নারী। জাতিসংঘের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ মিশনের (এইচআরএমএমইউ) তথ্যমতে, ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি-রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ১০ হাজার ৩৭৮ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১৯ হাজার ৬৩২ জন। নিহতদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৫৭৯ জন এবং নারী ২ হাজার ৯৯২ জন। এই পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, গাযায় ১৪০ দিনে ইসরাঈল যে পরিমাণ ফিলিস্তীনি শিশু ও নারীকে হত্যা করেছে, তা দুই বছরে ইউক্রেন রুশ হামলায় নিহত নারী ও শিশুর সংখ্যার চেয়ে অন্তত ৬ গুণ। এদিকে, ফিলিস্তীনি বিভিন্ন সূত্র বলছে, গাযায় নির্বিচারে বোমা ও বিস্ফোরক ব্যবহার করে চলেছে ইসরাঈল। বিগত ১৪০ দিনে ইসরাঈল গাযায় অন্তত ৬৬ হাজার টন বিস্ফোরক ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছে। গাযার আয়তন বিবেচনায় এই সময়ের মধ্যে অঞ্চলটির প্রতি বর্গকিলোমিটারে অন্তত ১৮৩ টন করে বিস্ফোরক ফেলেছে ইসরাঈলী দখলদারেরা। গাযায় ইসরাঈলের অব্যাহত হামলায় ১৯ লাখ ফিলিস্তীনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচি বলছে, গাযায় ৩ লাখ ৭৮ হাজার মানুষ ভয়াবহ খাদ্য সমস্যার মধ্যে দিন পার করছে। এছাড়া আরও ৯ লাখ ৩৯ হাজার মানুষ চরম খাদ্য অভাবের মধ্যে রয়েছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

ভাতের স্বাদ হবে গরুর গোশতের মতো!

ভাত খাচ্ছেন কিন্তু স্বাদ পাচ্ছেন গোশতের, এমন হলে কেমন হয়? এ অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার একদল বিজ্ঞানী। একটি নতুন হাইব্রিড খাবার উদ্ভাবন করেছেন তারা। ধানের ভেতরে গরুর গোশতের সমন্বয়ে এ হাইব্রিড খাদ্য তৈরি করা হয়েছে। এই ধান থেকে উদ্ভূত ভাতের স্বাদ হবে গোশতের মতো। এ হাইব্রিড খাদ্যকে পরিবেশের ওপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রভাব মোকাবিলার একটি উপায় হিসেবে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি গবেষণাপত্রটি 'ম্যাটার' নামের বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়নসি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমোলিকুলার ইঞ্জিনিয়ার সোহেয়ন পার্ক। গবেষণাগারে উদ্ভাবিত খাবারটি দেখতে গোশতের কিমা ও ভাতের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের মতো। তবে খাবারটি পুষ্টিসমৃদ্ধ ধান। গবেষণাটি সম্পর্কে ওয়েবসাইট সায়েন্স অ্যালার্টকে বিজ্ঞানী পার্ক বলেন, কোষ-কালচারড প্রোটিন চাল থেকে মানুষের প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি পাওয়ার কথা ভাবুন। ভাতে এমনিতেই উচ্চমাত্রায় পুষ্টি উপাদান আছে। কিন্তু প্রাণিসম্পদ থেকে কোষ যুক্ত করে এই পুষ্টি উপাদানকে আরও বাড়ানো যায়। পার্ক আরও বলেন, এই খাদ্য তৈরি একটু শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তবে এই খাদ্য একদিন খাবারের ওপর চাপ কমাতে পারে। গবেষণা দলের ভাতকে বেছে নেওয়ার কারণ হলো, এটি মানুষের প্রধান একটি খাদ্য। এতে ৮০ শতাংশ শ্বেতসার, ২০ শতাংশ প্রোটিনসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান আছে। সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এই খাবার দেখতে গোলাপি রঙের। গবেষকরা বলেছেন, এই চাল সস্তা, নিরাপদ, আরও টেকসই পরিবেশসম্মত গোশতের বিকল্প হতে পারে। গবেষকরা বলছেন, জলবায়ু সংকটের মধ্যে মানুষ যেভাবে খাচ্ছে, তাতে একটা বদল আনতে পারে এই চাল।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): 'শবেবরাতে মানুষের বার্ষিক রিযিক, হায়াত, মাউত ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়' এই কথার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: উক্ত কথা সঠিক নয়। বরং এর প্রমাণে যে হাদীছ রয়েছে, সেটি জাল। আর লায়লাতুল ক্বদরের রাতে মানুষের আগামী এক বছরের রিযিক, হায়াত, মাউত, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়, যা পবিত্র কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সে রাতে (পুরো এক বছরের) প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়' (আদ-দুখান, ৫৯/৪-৫)।

বিদআত

প্রশ্ন (২): আমাদের এলাকাতে ঈদের ছালাতের আগে অথবা ঈদের খুৎবার পরে অনেকে আবার বক্তৃতা দেয়। এমন কাজ কি ইসলামে বৈধ?

-মাহফুজুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর: ঈদের ছালাতের আগে ইমামসহ যেকোনো ব্যক্তির বক্তব্য বা খুৎবা দেওয়া বিদআত। সর্বপ্রথম মারওয়ান ঈদের ছালাতের আগে খুৎবার প্রবর্তন করে, আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু যার কঠোর বিরোধিতা করেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯)। আর ঈদের ছালাতের পরে ইমাম ছাহেব মুক্তাদীর দিকে ফিরে খুৎবা বা বক্তব্য দিবে, এটাই সুন্নাত। এমতাবস্থায় ইমাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির খুৎবা বা বক্তব্যে অংশগ্রহণ করা শরীআতসম্মত নয়। কেননা ছালাতের পরে যেকোনো ব্যক্তির কথা বলা প্রমাণিত নয়। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হতেন এবং সেখানে প্রথমে যা করতেন তা হলো ছালাত। অতঃপর জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন আর জনতা তখন নিজেদের কাতারে বসা থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, নছীহত করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। আর যদি কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করতেন তাদেরকে বাছাই করতেন অথবা যদি কাউকে কোনো নির্দেশ দেওয়ার থাকত, নির্দেশ দিতেন। অতঃপর বাড়ি ফিরে যেতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯৪)।

প্রশ্ন (৩): অনেক এলাকাতে দেখা যায় যে, বিশেষ করে জুমআর দিনে ও ঈদের দিনে তারা কবর যিয়ারত করতে যায়। এটা কি শরীআতসম্মত?

-শহিদুল ইসলাম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: ঈদের দিন ও জুমআর দিনে সবাই মিলে কবর যিয়ারত করতে যাওয়া বিদআত। কারণ এমন আমল রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাহাবীগণ ও তাবেঈগণ থেকে প্রমাণিত নয়। বরং যেকোনো দিনে যেকোনো সময়ে ব্যক্তিগতভাবে কবর যিয়ারত করতে যেতে হবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে' (আবূ দাঊদ, হা/৩২৩৫; তিরমিযী, হা/১০৫৪)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৪): জনৈক ব্যক্তির প্রায় প্রতি ওয়াক্তেই দুই এক ফোটা করে পেশাব ঝরে পড়ে। এক্ষেত্রে প্রতি ওয়াক্তের জন্য ওযূর পূর্বে কাপড় পরিবর্তন করা কিংবা গোসল করা অথবা নিচের অংশ ধৌত করা আবশ্যক কি?

-আব্দুল্লাহ
রাজশাহী।

উত্তর: এটা এক ধরনের রোগ। সুতরাং এর জন্য চিকিৎসা করতে হবে। আর এই রোগের কারণে পেশাব ঝরলে তাতে ছালাতের কোনো ক্ষতি হবে না। আর সম্ভব হলে, কাপড় পরিবর্তন করে ছালাত আদায় করাই ভালো। তবে মুস্তাহাযা মহিলার মতো এমন ব্যক্তিকে প্রতি ওয়াক্তে ওযূ করতে হবে (আবূ দাঊদ, হা/২৮৬)।

ছালাত

প্রশ্ন (৫): আমাদের মসজিদের ইমাম জর্দা দিয়ে পান খায় এবং তার কুরআন তেলাওয়াত অশুদ্ধ। তার কুরআন তেলাওয়াতে লাহনে জালী ও লাহনে খফী হয়। ইমামকে এ বিষয়ে বললে তিনি সংশোধন হন না এবং মসজিদ

www.al-itisam.com

কমিটিকে বললেও তারা ইমামকে পরিবর্তন করতে চান না। এরূপ ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আল আমিন
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর: জর্দা নেশাজাতীয় দ্রব্য, যা খাওয়া হারাম (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৪৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৩৩)। এ রকম ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা ঠিক নয়। তবে কোনো কারণে কেউ এ ধরনের ব্যক্তির পিছনে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদেরকে ইমাম ছালাত আদায় করাবেন। বস্তুত যদি ছালাত ভালোভাবে পড়ায় তবে তোমাদের জন্য সফলতা আছে (তার জন্যও আছে)। আর সে যদি কোনো ভুল করে ফেলে তাহলে তোমরা ছওয়াব পাবে। তার জন্য সে পাপী হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪)।

প্রশ্ন (৬): ছালাতে দাঁড়ানো ব্যক্তির কতটুকু সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-সাকিব আহম্মেদ
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর: ছালাতে সুতরা গ্রহণ করা আবশ্যক (আবূ দাঊদ, হা/৬৯৮; ইবনু মাজাহ, হা/৯৫৪)। আর সুতরা পরবর্তী স্থানে চলাচলের জন্য বৈধ। তবে ছালাত আদায়কারী যদি সুতরা গ্রহণ না করে, তাহলে উক্ত অবস্থায় তার সিজদার জায়গা থেকে এক ছাগল চলাচলের জায়গা বাদ দিয়ে, অর্থাৎ আনুমানিক চার হাত স্থান বাদ দিয়ে, তৎপরবর্তী স্থান দিয়ে চলাচল করা যাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৮)।

প্রশ্ন (৭): হাদীছে এসেছে মহিলা ও কালো কুকুর যদি ছালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে যায়, তাহলে ছালাত নষ্ট হয়ে যায়। এটাকে অনেক আলেম বলেন যে, এখানে ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য, ছালাত বাতিল হওয়া উদ্দেশ্য নয়। এটা কি সঠিক ব্যাখ্যা?

-মুহাম্মদ ফাইয়াজ খান
চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

উত্তর: হ্যাঁ, উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক। কেননা বিভিন্ন হাদীছের মাধ্যমে জানা যায় যে, সামনে দিয়ে মহিলা, গাধা পার হলে ছালাত বাতিল হবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সামনে ঘুমাতাম, আমার পা দুখানা তাঁর কিবলার দিকে ছিল। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন আমি পা দুখানা গুটিয়ে নিতাম। আর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা দুখানা প্রসারিত করতাম। তিনি রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না (ছহীহ বুখারী, হা/৩৮২)। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটা মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এলাম, তখন আমি ছিলাম সাবালক হবার নিকটবর্তী। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সামনে দেয়াল ব্যতীত অন্য কিছুকে সুতরা বানিয়ে মিনায় লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করছিলেন। কাতারের কিছু অংশ অতিক্রম করে আমি সওয়ারী হতে অবতরণ করলাম। গাধীটিকে চরাতে দিয়ে আমি কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। আমাকে কেউই এ কাজে বাধা দেয়নি (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৩)।

প্রশ্ন (৮): তারাবীহ ছালাত জামাআতে আদায় করার পর রাতে আরো নফল ছালাত আদায় করতে পারব কি?

-মামুনুর রশীদ
রাজশাহী।

উত্তর: রাতে তিন রাকআত বিতরসহ মোট এগারো রাকআতই ছালাত আদায় করতে হবে, এর বেশি ছালাত আদায় করা যাবে না। আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে জিজ্ঞেস করেন, রামাযান মাসে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতে) এগার রাকআতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন। তুমি সেই ছালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি আরো চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকআত (বিতর) ছালাত আদায় করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৭)।

প্রশ্ন (৯): একই ইমাম ঈদের জামাআতে একাধিক বার ইমামতি করতে পারে কি?

-শামীম রেজা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: একই মাঠে একই ইমাম দিয়ে একাধিক বার ঈদের ছালাত আদায় করালে সুন্নাত বিরোধী হবে। কেননা ঈদের ছালাতের নির্ধারিত সময় হলো, সূর্য উঠার পরপরই আদায়

করা। অতএব, এক ঈদের মাঠে এক ইমাম দ্বারা একবার ছালাত আদায় করাই সুন্নাতসম্মত। জনগণ বেশি হলে মাঠ প্রশস্ত করতে হবে। অন্যথায় আপসে মাঠ ভাগ করতে হবে। তবুও এক মাঠে একাধিক বার ছালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১০): আমাদের এলাকাতে জনৈক মহিলা অন্যান্য মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে ছালাতে যেতে নিষেধ করেন। বরং তিনিই সেই মহিলাদেরকে নিয়ে ঈদের জামাআত করেন। প্রশ্ন হলো, মহিলা ইমামের পিছনে মহিলারা ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে যেতেই হবে। কেননা রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে যেতে আদেশ করেছেন। উম্মু আতিয়্যাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদের দিনে ঋতুমতী এবং পর্দানশীন নারীদের বের করে আনার আদেশ দিয়েছেন, যাতে তারা মুসলিমদের জামাআত ও দুআয় অংশগ্রহণ করতে পারে। অবশ্য ঋতুমতী নারীগণ ছালাতের জায়গা হতে দূরে অবস্থান করবে। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের কারো কারো ওড়না নেই। তিনি ﷺ বললেন, 'তার সাথীর উচিত তাকে নিজের ওড়না পরিয়ে দেওয়া' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০)। আর মহিলারা নফল ছালাতসহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের ইমামতি করতে পারলেও ঈদের ছালাত ও জুমআর ছালাতে ইমামতি করতে পারবে না। কেননা তাতে খুৎবা আছে। আর মহিলাদের জন্য খুৎবা দেওয়া জায়েয নয়। শরীআতে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে কেউ এমন কোনো আমল করল, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (১১): ঈদুল ফিতরের দিনে কখন থেকে কখন পর্যন্ত তাকবীর পড়তে হয়?

-সাদেকুর রহমান
গাইবান্ধা।

উত্তর: ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে বের হওয়ার পর থেকে ছালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ২/৭১-৭২; ইরওয়া, ৩/১২১)।

প্রশ্ন (১২): ঈদের দিনের সকালের সুন্নাতী আমলসমূহ কী কী?

-আরিফুল ইসলাম
ময়মনসিংহ।

উত্তর: ঈদের দিনে সকালের কতিপয় সুন্নাতী আমল নিম্নরূপ: প্রথমত, ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের ছালাতে বের হওয়ার আগে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে ঈদের মাঠে যাবে। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিনে না খেয়ে যাবে এবং ছালাতের পর নিজ কুরবানীর গোশত বা কলিজা বা অন্য কিছু দিয়ে নাশতা করবে। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে (ঈদগাহে) বের হতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৩)। বুরায়দা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে বের হতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না (ছহীহ তিরমিযী, হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৪)। দ্বিতীয়ত, ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে বের হওয়ার পর থেকে ছালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে। আর ঈদুল আযহার ৯ যিলহজ্জ আরাফার দিন ফজর হতে ১৩ যিলহজ্জ আছর ছালাতের পর পর্যন্ত নারী-পুরুষ তাকবীর পাঠ করবে। তবে নারীরা নিম্নস্বরে তাকবীর পাঠ করবে (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ২/৭১-৭২; ইরওয়া, ৩/১২১)। তৃতীয়ত, রাস্তা পরিবর্তন করবে অর্থাৎ ঈদগাহে যে রাস্তায় যাবে, তা ব্যতীত ভিন্ন রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করবে (ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৬)।

প্রশ্ন (১৩): মহিলাদের জন্য কি ঈদের মাঠে যাওয়া জরুরী?

-আফরোজা খাতুন
রাজশাহী।

উত্তর: মহিলাদের জন্যও ঈদের মাঠে যাওয়া জরুরী। কেননা তাদেরকে ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য রাসূল ﷺ জোরালোভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। উম্মু আতিয়্যাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমাদের নির্দেশ দেওয়া হতো, আমরা যেন ঋতুমতী ও পর্দানশীল মহিলাদেরও দুই ঈদের দিনে (ঈদগাহে) বের করি, যাতে তারা মুসলিমদের জামাআতে এবং তাদের দু'আয় শামিল হতে পারে; কিন্তু ঋতুমতীগণ যেন তাদের ছালাতের স্থান হতে একদিকে সরে বসে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের কারো যদি (শরীর ঢাকবার) বড় চাদর না থাকে। রাসূল ﷺ বললেন, 'তার সাথী তাকে যেন আপন চাদর পরায়' (ছহীহ বুখারী,

হা/৩৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০)। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি ঈদের দিনে নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছালাতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তিনি খুৎবার পূর্বে ছালাত আরম্ভ করলেন আযান ও ইক্বামত ছাড়া এবং যখন ছালাত শেষ করলেন বিলালের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহর মহিমা ও তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করলেন। তৎপর লোকদেরকে উপদেশ দিলেন। তাদেরকে (পরকালের কথা) স্মরণ করালেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে অগ্রসর হলেন আর তখন তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল, তাদেরকে তিনি আল্লাহভীতির উপদেশ দিলেন, কিছু নছীহত করলেন এবং (আখেরাতের কথা) স্মরণ করালেন (ছহীহ নাসাঈ, হা/১৫৭৫; ইবনু খুযায়মাহ, হা/১৪৬০)। উপরিউক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলারা ঈদের মাঠে গিয়েই ঈদের ছালাতে অংশগ্রহণ করবে এবং ঋতুমতী মহিলাগণ ছালাত আদায় করবে না; বরং খুৎবা ও তাকবীরে শরীক হবে।

প্রশ্ন (১৪): ঈদের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি কী?

-আকরামুল হক
নওগাঁ।

উত্তর: ঈদের ছালাতে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্বিরাআতের পূর্বে প্রথম রাকআতে সাত ও দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ সহ মোট বারো তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকআতে সাত তাকবীরের পর ছানা ও আঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ও সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দেওয়ার পর শুধু বিসমিল্লাহ বলে সূরা ফাতিহা ও গাশিয়া পড়তেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮)। কাসীর তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই ঈদের ছালাতের প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন (ছহীহ তিরমিযী, হা/৫৩৬; ইবনু মাজাহ, হা/১২৭৯)। ছালাত শেষে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলালের গায়ে ভর দিয়ে খুৎবা প্রদান করতেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে দান-খায়রাতের নছীহত করতেন এবং বিলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তার চাদরে মহিলাদের দান গ্রহণ করতেন (ছহীহ নাসাঈ, হা/১৫৭৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৪২০)। ওয়ায়েল ইবনু হুজরের হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাত উত্তোলন করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৪০১)।

প্রশ্ন (১৫): ঈদের খুৎবা একটি নাকি দু'টি?

-আহসান হাবীব
রাজশাহী।

উত্তর: ঈদের খুৎবা একটি। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে একটি খুৎবা দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ঈদের ছালাতে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ছিলাম। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের ছালাতের আযান ও ইক্বামতের কথা উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি মহিলাদের নিকট আসলেন, তাদের ওয়ায-নছীহত করলেন, দান-খায়রাত করার জন্য উৎসাহিত করলেন... (ছহীহ বুখারী, হা/৯৬৩-৯৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৫)। এতে প্রমাণ করে যে, ঈদের খুৎবা একটি।

উল্লেখ্য, দুই খুৎবা দেওয়ার প্রমাণে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেটি যঈফ (যঈফ ইবনু মাজাহ, হা/১২৮৯)।

যাকাত

প্রশ্ন (১৬): আমি জমি ভাড়া নিয়েছি যে টাকা দিয়ে তার থেকেও অনেক বেশি টাকা অগ্রিম দিয়েছি। এই প্রদত্ত অতিরিক্ত টাকার কি যাকাত দিতে হবে?

-সুজন মিয়া
কুড়িগ্রাম।

উত্তর: যেহেতু সেটি জমির ভাড়া বাবদ দেওয়া হয়েছে, আর আর সেটার নিশ্চিতরূপে আপনি মালিক নন, কাজেই মালিকবিহীন টাকার যাকাত লাগবে না। তবে আপনার জমি হতে উৎপাদিত ফসল যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদিত ফসল যদি ১৮ মণ ৩০ কেজি হয় আর বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হয়, তাহলে সেই ফসল থেকে দশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। আর সেচের পানিতে উৎপাদিত হলে বিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৫৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮০)।

প্রশ্ন (১৭): যাকাতের টাকা কি কোনো প্রতিষ্ঠানে (যারা গরীব, বেতনের টাকা দিতে কষ্ট হয়) দেওয়া যাবে?

-সাইদুল ইসলাম
ময়মনসিংহ।

উত্তর: উক্ত প্রতিষ্ঠানে যদি কুরআন ও হাদীছ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে সেটি ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, ফলে তাতে

যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে। কেননা যাকাত পাবে আট শ্রেণীর ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘ছাদাক্বাসমূহ শুধুমাত্র নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত এবং ছাদাক্বা (আদায়ের) কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরের জন্য। এ হলো আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত (ফরয বিধান)। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়’ (আত-তাওবা, ৯/৬০)।

তবে প্রতিষ্ঠানটি সঠিক আক্বীদা ও আদর্শের ওপর পরিচালিত হয় কি-না তা যাকাতদাতার বিবেচনা করা উচিত। কেননা অনেক সময় এই দানের মাধ্যমে শিরক ও বিদআতকে সহযোগিতা করা হয়।

প্রশ্ন (১৮): যাকাতের টাকা শুধু এক শ্রেণির যেমন গরীব নিকটাত্মীয়দের দেওয়া যাবে কি?

-মো. লতিফুর রহমান
চিরির বন্দর দিনাজপুর।

উত্তর: নিকটাত্মীয়-স্বজন যদি যাকাতের হক্বদার হয়, তাহলে তাদের যাকাত দিলে দ্বিগুণ নেকী পাওয়া যাবে। একদা এক আনছারী মহিলা ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর স্ত্রী যয়নাব বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর মাধ্যমে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের স্বামীদের প্রতি ও স্বামীদের পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি যাকাত দিলে এটা তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘তাদের জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। আত্মীয়তার নেকী এবং দানের নেকী’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০০)। কারণ আল্লাহ তাআলা আট শ্রেণির লোকদের সকলকেই সমানভাবে যাকাত বণ্টন করে দেওয়ার আদেশ করেননি; বরং আট শ্রেণির লোক এই সম্পদের হক্বদার বলে উল্লেখ করেছেন (আত-তাওবা, ৯/৬০)। অতএব, যখন যেখানে যতজন হক্বদার থাকবে, তাদের হক্বের পরিমাণ বিবেচনা করে প্রদান করতে হবে। সবাইকে সমান দেওয়াও আবশ্যক নয়। প্রয়োজনে কোনো হক্বদারকে বাদ দিয়ে গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্যকে সম্পূর্ণ মাল দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন (১৯): টাকা দ্বারা ফিতরা আদায় করা যাবে কি?

-শাহাবুর রহমান
ঝিনাইদহ।

উত্তর: টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে না; বরং খাদ্যদ্রব্য দিয়েই ফিতরা আদায় করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মুদ্রার প্রচলন ছিল, তবুও তিনি ফিতরা হিসাবে মুদ্রা প্রদানের কথা বলেননি; বরং খাদ্যশস্যের কথা বলেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমরা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ঈদুল ফিতরের পূর্বে এক ছা‘ খাদ্য ফিতরা দিতাম। তখন আমাদের খাদ্য ছিল ঘি, কিসমিস, পনীর ও খেজুর (ছহীহ বুখারী, হা/১৫১০; বায়হাক্বী, ৪/২৭৯)। সুতরাং খাদ্যশস্য দ্বারাই ফিতরা আদায় করতে হবে। এছাড়াও ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে মুদ্রা দিয়ে ফিতরা দেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন (২০): ছাদাক্বার নিয়তে বেশি করে ফিতরা আদায় করা জায়েয হবে কি?

-নাজমুল হক
রংপুর।

উত্তর: রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এক ছা‘ (ছহীহ বুখারী, হা/১৫১০)। ফিতরার নামে এর বেশি পরিমাণ দেওয়ার দলীল কুরআন ও সুন্নাহতে আসেনি। কিন্তু কেউ যদি এক ছা‘ ফিতরার নিয়তে দেয় আর অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য ছাদাক্বার নিয়তে দেয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (২১): যারা কৃপণতাবশত যাকাত দেয় না, তাদের বিধান কী?

-রুবেল ইসলাম
রংপুর।

উত্তর: যারা যাকাতের বিধানকে অস্বীকার করে না, বরং কৃপণতাবশত যাকাত দেয় না তারা ফাসিক ও কবীরা গুনাহকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে এবং সেসব দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে, বলা হবে, এগুলোই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। কাজেই তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তার স্বাদ ভোগ করো’ (আত-তাওবা, ৯/৩৪-৩৫)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘সোনা-রূপার মালিক যেসব লোক এর হক্ব (যাকাত) আদায় করে না কিয়ামতের দিন তার এই সোনা-রূপা দিয়ে আগুনের অনেক পাত বানানো হবে, তারপর সেগুলো

জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর সেগুলো দিয়ে তার কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই ঠান্ডা হয়ে যাবে পুনরায় আবার তা উত্তপ্ত করা হবে। এরূপ করা হবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। লোকদের বিচার শেষ না হওয়া অবধি তার এরূপ শাস্তি চলতে থাকবে। তারপর সে তার পথ ধরবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৭)।

প্রশ্ন (২২): কোনো ব্যক্তি যদি যাকাত দিতে না চায়, কিন্তু জোরপূর্বক যদি তার থেকে যাকাত নেওয়া হয়, তাহলে কি সম্পদের মালিকের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় হয়ে যাবে?

-সামিউল ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর: জোরপূর্বক যাকাত আদায় করলেও তা সম্পদের মালিকের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছিলেন, আল্লাহর শপথ! তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করব যারা ছালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হলো সম্পদের উপর আরোপিত হক্ব। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তার সিদ্ধান্তই যথার্থ (ছহীহ বুখারী, হা/১৪০০)।

প্রশ্ন (২৩): অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের ওপর কি যাকাত ফরয হবে?

-এনামুল হক
ঢাকা।

উত্তর: হ্যাঁ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার ওপরও যাকাত ফরয হবে। কেননা যাকাত ফরয হয় সম্পদের ওপর। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাদের সম্পদের ছাদাক্বা ধনীদের নিকট হতে নেওয়া হবে আর দরিদ্রদের মধ্যে প্রদান করা হবে (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৯৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯)। এই বর্ণনা প্রমাণ করে যে, যার সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয়, তার ওপর যাকাত ফরয হবে, হোক সে ব্যক্তি শিশু বা পাগল বা বৃদ্ধ। এমতাবস্থায় তাদের অভিভাবকরা এই যাকাত দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে।

প্রশ্ন (২৪): কাগজের নোটে কি যাকাত দিতে হবে?

-মাসুদ রানা
টাঙ্গাইল।

উত্তর: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনা ও রূপাতে যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি বলেছেন, যদি সেগুলো নিসাব পরিমাণ হয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমার কাছে দুইশ দিরহাম থাকলে এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে পাঁচ দিরহাম (যাকাত) দিবে। স্বর্ণের ক্ষেত্রে বিশ দীনারের কমে যাকাত নেই। বিশ দীনারে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে অর্ধ-দীনার যাকাত দিতে হবে। এরপর যা বাড়বে তাতে উপরিউক্ত হিসেবে যাকাত দিতে হবে (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)। বর্তমানে মানুষের হাত থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা হারিয়ে যাওয়ার পরে লেনদেন ও মূল্যের ক্ষেত্রে কাগজের নোট তার স্থান দখল করেছে। যাকাত, দিয়াত, পণ্যের মূল্য, সূদের বিধিবিধান ও অন্যান্য যেক্ষেত্রে এই দুই মুদ্রা (স্বর্ণ ও রোপ্য) ব্যবহৃত হয় সেসব ক্ষেত্রে বর্তমান মুদ্রায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিধান প্রযোজ্য হবে। সুতরাং কাগজের নোটসহ যেগুলোই মুদ্রা হিসেবে বিবেচিত হবে, সেগুলোতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের হিসেব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে, যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় (তাওযীহুল আহকাম, ৩/৩১৯)।

প্রশ্ন (২৫): আমার নিকট যে সোনা ও রূপা রয়েছে সেগুলো দিয়ে নিসাব পরিমাণ হবে। কিন্তু শুধু সোনা নিসাব পরিমাণ হবে না এবং রূপাও নিসাব পরিমাণ হবে না। বরং সোনা ও রূপাকে একত্রিত করলে নিসাব পরিমাণ হবে। এখন আমাকে কি এগুলোর যাকাত দিতে হবে?

-হুমায়রা
রাজশাহী।

উত্তর: না, এক্ষেত্রে যাকাত দিতে হবে না। কেননা সোনার নির্দিষ্ট নিসাব রয়েছে, আবার রূপারও নির্দিষ্ট নিসাব রয়েছে (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)। সোনা ও রূপা পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ হলে তবেই যাকাত দিতে হবে, অন্যথায় যাকাত ফরয হবে না (আল-মুগনী, ৪/২১০-২১১)।

প্রশ্ন (২৬): কোনো ব্যক্তির ন্যূনতম কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার ওপরে যাকাতুল ফিতর ফরয হবে?

-মাসুদ করিম
রাজশাহী।

উত্তর: গরীব, ফকীর-মিসকীন সকলের ওপরই যাকাতুল ফিতর ফরয। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা, আযাদ ও গোলামের পক্ষ হতে এক ছা‘ খেজুর বা এক এক ছা‘ যব ছাদাক্বাতুল ফিতর হিসেবে ফরয করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪)।

প্রশ্ন (২৭): ফিতরা কি যাকাতের মতো আট খাতে বণ্টন করা যাবে?

-গিয়াসুদ্দীন
ঢাকা।

উত্তর: ফিতরাকে আট খাতে বণ্টন করা যাবে না, বরং ফিতরা শুধু ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। কেননা ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাদাক্বাতুল ফিতর ফরয করেছেন অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রামাযানের) ছওমকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য (আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯)।

প্রশ্ন (২৮): ঈদের ছালাতের পরে ফিতরা দিলে কি তা ফিতরা বলে গণ্য হবে?

-জাহিদ হাসান
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর: ঈদের ছালাতের আগেই ফিতরা বের করতে হবে। ঈদের ছালাতের পরে আদায় করলে, তা আর ফিতরা বলে গণ্য হবে না; বরং সেটি সাধারণ দানে পরিণত হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের পূর্বে তা আদায় করে সেটা কবুল ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাতের পরে আদায় করে, তা সাধারণ দান হিসেবে গৃহীত হবে (আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯)।

প্রশ্ন (২৯): অনেকেই রামাযানের অর্ধেক পার হলেই ফিতরা দেওয়া শুরু করে। এমন কাজ কি শরীআতসম্মত?

-সিহাবুদ্দীন
বগুড়া।

উত্তর: এমনটি করা জায়েয নয়। কেননা শাওয়ালের চাঁদ উঠার পরে ফিতরা ফরয হয়। তাই ফিতরা দেওয়ার সর্বোত্তম সময় হলো, শাওয়ালের চাঁদ উঠা থেকে ঈদের ছালাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। আর কেউ যদি আগে দিতেই চায়, তাহলে সর্বোচ্চ ঈদের এক-দুইদিন আগে দিতে পারে। নাফে রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যারা যাকাতুল ফিতর আদায় করতেন ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা তাদেরকে যাকাতুল ফিতর দিতেন আর তারা ঈদের একদিন বা দুইদিন আগেই আদায় করে দিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১)।

ছিয়াম

প্রশ্ন (৩০): ই‘তিকাফ করার বিধান কী? কোনো এলাকাতে কেউ ই‘তিকাফ না করলে কি এলাকার সকলেই গুনাহগার হবে?

-আব্দুস সামাদ
বগুড়া।

উত্তর: ই‘তিকাফ করা হলো সুন্নাত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা মসজিদে ই‘তিকাফ থাকাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না’ (আল-বাকারা, ২/১৮৭)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই‘তিকাফ করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই‘তিকাফ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭৩)। এছাড়াও ই‘তিকাফ করা সুন্নাহ হওয়ার বিষয়ে ইজমা রয়েছে (আল-মাজমূ, ৬/৪০৭; আল-মুগনী, ৪/৪৫৬)। তবে এলাকাতে কেউ ই‘তিকাফ না করলে সকলেই গুনাহগার হবে এমন বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৩১): ই‘তিকাফের ক্ষেত্রে কি ছিয়াম থাকা শর্ত?

-আশরাফুল ইসলাম
বগুড়া।

উত্তর: ছিয়াম থাকাবস্থায় ই‘তিকাফ করা সুন্নাত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ই‘তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো, সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, ছিয়াম না রেখে ই‘তিকাফ করবে না এবং জামে মসজিদে ই‘তিকাফ করবে (আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩)।

প্রশ্ন (৩২): ই‘তিকাফে বসার সময় কখন?

-আতাউর রহমান
ময়মনসিংহ।

উত্তর: ২০ রামাযান অতিবাহিত হওয়ার পর মাগরিবের পর ই‘তিকাফে প্রবেশ করবে। কারণ শেষ দশক আরম্ভ হয় ২০ রামাযানের সূর্য ডুবার পর হতে (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২)। আর ২১ তারিখ ফজর পর হতে ই‘তিকাফকারী সম্পূর্ণ একাকী ইবাদতে মশগুল থাকবে (ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ২০/১৭০)।

প্রশ্ন (৩৩): অনেক এলাকাতে দেখা যায় যে, মহিলারা তাদের বাড়িতে ই'তিকাফ করে। আমার প্রশ্ন হলো, মহিলারা কি বাড়িতে ই'তিকাফ করতে পারে?

-সাইফুল ইসলাম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: না, মহিলারা বাড়িতে ই'তিকাফ করতে পারবে না। বরং মহিলা-পুরুষ সবাইকেই মসজিদে ই'তিকাফ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ থাকাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না' (আল-বাকারা, ২/১৮৭)। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জামে মসজিদ ছাড়া কোনো ই'তিকাফ নেই (আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩)। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণ মসজিদেই ই'তিকাফ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২)। সুতরাং অবশ্যই মহিলাদেরকেও মসজিদেই ই'তিকাফ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, মসজিদে ই'তিকাফের ব্যবস্থা না থাকলে তাকে কোথাও ই'তিকাফ করার প্রয়োজন নেই। আর মহিলারা মসজিদে ই'তিকাফ করতে চাইলে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে এবং মসজিদে পর্দার ব্যবস্থা ও ফিতনার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৪): ই'তিকাফকারী কি বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হতে পারবে?

-আইয়ুব আলী
রংপুর।

উত্তর: না, ই'তিকাফকারী বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। কেননা ই'তিকাফ অবস্থায় পেশাব-পায়খানা ও জরুরী কাজ ছাড়া মসজিদ হতে বের হওয়া নিষেধ। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো, সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, ছিয়াম না রেখে ই'তিকাফ করবে না এবং জামে মসজিদে ই'তিকাফ করবে (আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩)।

প্রশ্ন (৩৫): শাওয়াল মাসে ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত কী? কারো যদি রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম অবশিষ্ট থাকে, তাকে কি আগে শাওয়ালের ছিয়াম পালন করতে হবে?

-ফাতেমা খাতুন
রাজশাহী।

উত্তর: রামাযানের ছিয়াম পালনের সাথে শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম পালন করলে পূর্ণ বছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়। আবূ আইয়ূব আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, এটা (তার) পূর্ণ বছরের ছিয়ামের সমান হবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪)।

আর রামাযানের কাযা ছিয়াম পালন করার আগে শাওয়ালের ছিয়াম পালন করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। কেননা শাওয়াল মাস চলে গেলে আর শাওয়ালের ছিয়াম পালন করা যায় না। আর ক্বাযা ছিয়াম পালনের সময় থাকে পরের রামাযান পর্যন্ত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার রামাযানের ছিয়াম বাকি থাকত, আমি তা (পরবর্তী) শা'বান ব্যতীত পূর্ণ করতে পারতাম না (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৬)।

বিবাহ

প্রশ্ন (৩৬): বিয়ের ক্ষেত্রে একটা মেয়ে যদি মন থেকে রাজি না থাকে, কিন্তু মুখে বলে রাজি আর বাবা যদি বিয়ের দিন মেয়ের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয়, তাহলে কি বিয়ে শুদ্ধ হবে? কিংবা যদি এমন হয় মেয়ে বিয়েতে আগে রাজি ছিল না, কিন্তু বিয়ের দিনে সে রাজি। অতঃপর বাবা যদি মেয়ের অনুমতি ছাড়া বিয়ে পড়িয়ে দেয়, তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হবে কি-না?

-সাদিয়া
ঢাকা।

উত্তর: কোনো বাবার জন্য তার মেয়ের সন্তুষ্টি ছাড়া তাকে কারো সাথে বিবাহ দেওয়া জায়েয নয়। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো বিধবা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না'। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কেমন করে তার অনুমতি নেয়া হবে? তিনি বললেন, 'তার চুপ থাকাটাই হচ্ছে তার অনুমতি' (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৩৬)। তবে কোনো বাবা যদি তার মেয়ের সন্তুষ্টি ছাড়াই কারো সাথে বিবাহ দিয়ে দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিবাহ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই মেয়ের জন্য বিয়ের পরে সংসার করা বা না করার ইখতিয়ার থাকবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে

বর্ণিত, একদা নবী ﷺ-এর নিকট এক যুবতী এসে বলল, তার অসম্মতিতে তার পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছে। নবী ﷺ তাকে (বিবাহ বলবৎ রাখা বা না রাখার) ইখতিয়ার প্রদান করলেন (আবূ দাঊদ, হা/২০৯৬)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৭): এখন বাজারে তো পুতুল অথবা হাঁস-মুরগি, পশুপাখি অবয়বের বিভিন্ন খেলনা পাওয়া যায়। এগুলো ক্রয় করা যাবে কি এবং এইগুলো ঘরে রাখলে ছালাত হবে কি?

-রুহুল ইসলাম
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর: হাঁস-মুরগি অথবা পশুপাখির অবয়বে পুতুল বা খেলনা তৈরি করা হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারী বা প্রস্তুতকারী জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তার প্রস্তুতকৃত প্রতিটি ছবিকে জীবন দেওয়া হবে, সে সময় জাহান্নামে তাকে ঐগুলো শাস্তি দিতে থাকবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/২২২৫, ৫৯৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২১১০)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ‘ক্বিয়ামতের দিনে ছবি বা মূর্তি নির্মাতাদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি হবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬৫৯)। আর এগুলো ক্রয় করাও যাবে না। কেননা এতে অন্যায়কে সহযোগিতা করা হবে, যা নিষেধ (আল-মায়েদা, ৫/২)। আর এগুলো ঘরে রেখে ছালাত আদায় করলে, সেই ছালাত শুদ্ধ হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘কুকুর অথবা ছবি থাকে এমন ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না’ (তিরমিযী, হা/২৮০৪; ইবনু মাজাহ, হা/৩৬৪৯)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নবী ﷺ বললেন, ‘আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ ছালাত আদায়ের সময় এর ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৪)।

প্রশ্ন (৩৮): আমরা জানি যে, প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা হারাম। তাহলে গাছপালা, পাহাড় কিংবা যেকোনো প্রাকৃতিক ছবি হাতে আঁকাও কি হারাম হবে? দয়া করে জানাবেন।

-রুহুল ইসলাম
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর: গাছপালা, পাহাড় কিংবা যেকোনো প্রাকৃতিক ছবি অঙ্কন করাতে শারঈ কোনো বাধা নেই। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, তোমাকে একান্তই যদি তা (ছবি অঙ্কন) করতে হয়, তাহলে গাছ এবং যার জীবন নেই, সে সব বস্তুর ছবি তৈরি করো (ছহীহ মুসলিম, হা/২১১০)।

প্রশ্ন (৩৯): পানি ব্যতীত অন্যান্য তরল পদার্থ দাঁড়িয়ে পান করার বিধান আছে কি?

-সাকিব আহম্মেদ
বাসাইল, টাঙ্গাইল

উত্তর: পানি এবং অন্যান্য তরল পদার্থসহ যেকোনো খাবার বসে খাওয়াই সুন্নাত। কারণ রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২০২৪-২০২৫)। তবে কেউ দাঁড়িয়ে পান করলেও তাতে কোনো গুনাহ হবে না (শারহ মুসলিম, আন-নববী, ১৩/১৯৫)। তবে যমযমের পানি পান করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ নিজেই দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৬৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২০২৭)।

প্রশ্ন (৪০): কোনো ব্যক্তি যদি বারবার মিথ্যা কথা বলে সাহায্য চায় এবং এর ফলে যদি তার মিথ্যা বলার পরিমাণ বাড়তে থাকে, তাহলে তাকে সাহায্য করার বিধান কী? যেখানে সবাই জানে, সে মিথ্যা বলছে।

-সাদিয়া
ঢাকা।

উত্তর: জরুরী প্রয়োজন ছাড়া মানুষের কাছে চাওয়া করা জায়েয নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১০৪৪)। কেননা কোনো সচ্ছল ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা নেওয়া বৈধ নয় (আবূ দাঊদ, হা/১৬৩৪; তিরমিযী, হা/৬৫২)। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে অভাবগ্রস্থ হয়, তাহলে তাকে সাহায্য করতে হবে। আর যদি নিশ্চিতভাবেও জানা যায় যে, সে অভাবগ্রস্থ নয়, তবুও তাকে সাহায্য করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর আপনি ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না’ (আয-যুহা, ৯৩/১০)।

প্রশ্ন (৪১): আমাদের সমাজের কোনো লোক মারা গেলে আগে খানাপিনার ব্যবস্থা করা হতো। বর্তমানে তার পরিবর্তে মসজিদে টাকা দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির জন্য এটা করা কি বৈধ হবে?

-কামরুল হাসান
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তির নামে মসজিদে দান করলে সে তার প্রতিদান পাবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার পিতা মারা গেছেন এবং সম্পদ রেখে গেছেন। কিন্তু তিনি অছিয়ত করে যাননি। এগুলো যদি তার জন্য ছাদাক্বা করা হয় তাহলে কি তার গুনাহ মাফ হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'হ্যাঁ' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩০; ইবনু মাজাহ, হা/২৭১৬)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, একদা একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু কোনো অছিয়ত করে যাননি। আমার ধারণা তিনি কথা বলতে পারলে ছাদাক্বা করতেন। এখন আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করলে তিনি নেকী পাবেন কি? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'হ্যাঁ' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৪)।

প্রশ্ন (৪২): খেজুর ও কিসমিস কি একত্রে ভিজিয়ে রাখা যাবে? যদি রাখা যায় তাহলে কি সেই পানি পান করা যাবে?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: খেজুর ও কিসমিস একত্রে ভিজানো যাবে না। আবূ কাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুকনো খেজুর ও আধাপাকা খেজুর এবং শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্র করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬০২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৮৬)।

প্রশ্ন (৪৩): আমি প্রিন্টিং ব্যবসা করি। আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ছবিসহ শিরক-বিদআত, হারাম ও অনৈসলামিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পোস্টার, লিফলেট, দাওয়াত কার্ডের কাজ করা হয়। এর সাথে অনেক ভালো ও বৈধ কাজেরও অর্ডার পাওয়া যায়। এমন ব্যবসা কি বৈধ হবে?

-মুস্তাফিজুর রহমান
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: জেনেশুনে শিরক-বিদআত ও অনৈসলমিক অনুষ্ঠানের পোষ্টার, লিফলেট তৈরি করে দেওয়া যাবে না। কেননা এতে পাপ কাজে সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৪৪): কিস্তিতে পণ্য কেনা যাবে কি?

-সেলিম রেজা
ঢাকা।

উত্তর: যদি কেনাবেচার চুক্তির সময় পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট করা থাকে এবং তাতে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই সম্মতি থাকে, তাহলে এমন বেচাকেনা জায়েয। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বারীরাকে মুক্ত করেছিলেন কিস্তির ভিত্তিতে টাকা দেওয়ার বিনিময়ে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৬)। তবে এরূপ শর্ত থাকা যাবে না যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। যেমন- এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করলে ১০০ টাকা এবং দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করলে ১২০ টাকা ইত্যাদি। একে বলা হয় একের মধ্যে দুই বিক্রয়, যা সুস্পষ্ট হারাম। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একই বিক্রির মধ্যে দুই রকমের বিক্রি হতে নিষেধ করেছেন (মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/২৪৪৪; তিরমিযী, হা/১২৩১)।

প্রশ্ন (৪৫): বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্য-সামগ্রী ক্রয়ের পূর্বে শুধুমাত্র পণ্যের ছবি দেখে অনলাইনে টাকা পাঠিয়ে দিতে হয়। অনলাইনভিত্তিক এই ব্যবসা করা যাবে কি?

-নাজমুল হক
নাটোর।

উত্তর: অনলাইনের ব্যবসায় যদি পণ্যের ধরন স্পষ্ট হয় এবং ক্রেতা প্রতারণার শিকার না হয় তাহলে এ ব্যবসা জায়েয হবে এবং অনলাইনের আদান-প্রদানও জায়েয হবে। আর পণ্য যদি স্পষ্ট না হয় এবং প্রতারণার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এমন বেচাকেনা করা যাবে না। এটা ধোঁকাবাজির শামিল হতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধোঁকামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১০২)।

প্রশ্ন (৪৬): চাকরিস্থলে অনেক সময় আমার এক সহকর্মী সময়মতো আসতে পারে না। আমাকে অনুরোধ করলে আমি তার হয়ে হাজিরা খাতায় সই করে দিই। এটা কি বৈধ হবে?

-আনোয়ার হোসনে
রাজশাহী।

উত্তর: এমন কাজ হারাম। কেননা এতে কর্তৃপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া হয়। আর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬)।

মীরাছ

প্রশ্ন (৪৭): আমার ভিটাবাড়িতে ও মাঠে কিছু জমি আছে। কিন্তু আমার দুই মেয়ে ছাড়া আর কোনো সন্তান নেই। তাই যদি ভিটাবাড়ির জমিটুকু মেয়েদেরকে এবং মাঠের জমিটুকু ভাতিজাদেরকে দেই, তাহলে কি তা করা যাবে?

-মামুনুর রশীদ
রাজশাহী।

উত্তর: ভিটা জমির মূল্য ও আবাদী জমির মূল্য সমন্বয় ও বিবেচনা করে, ভাতিজাদের সাথে পরামর্শ করে, মেয়েদেরকে ভিটাজমি লিখে দেওয়া যায়। কেননা সম্পদের মালিক জীবিত থাকাকালীন অংশীদারির কোনো একজনকে সম্পদ দিতে পারে না। অতএব, যখন মেয়েদেরকে ভিটাবাড়ি লিখে দিবে, তখন ভাতিজাদেরকেও লিখে দিতে হবে। নু‘মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাতা আমার পিতাকে তার মালের কিছু আমাকে দান করতে বললেন। পরে তা দেওয়া ভালো মনে করলে আমাকে তা দান করেন। তিনি (আমার মাতা) তখন বললেন, নবী ﷺ-কে সাক্ষী মানা ব্যতীত আমি রাজী নই। অতঃপর তিনি (আমার পিতা) আমার হাত ধরে আমাকে নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন, আমি তখন বালক মাত্র। তিনি বললেন, এর মা বিনতু রাওয়াহা একে কিছু দান করার জন্য আমার নিকট আবেদন জানিয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘সে ব্যতীত তোমার আর কোনো ছেলে আছে?’ তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। নু‘মান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমার মনে পড়ে, তিনি ﷺ বলেছিলেন, ‘আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী করো না’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৩)।

হাদীছ

প্রশ্ন (৪৮): কেউ কারো জন্য দু‘আ করলে ফেরেশতাগণ ঐ দু‘আকারীর জন্য দু‘আ করেন। এর প্রমাণে কোনো ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-জহিরুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর: হ্যাঁ, কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি অপর মুসলিম ব্যক্তির জন্য দু‘আ করে তাহলে ফেরেশতাগণ ঐ দু‘আকারীর জন্য অনুরূপ দু‘আ করেন। আবূ দারদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘কোনো মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু‘আ করলে একজন ফেরেশতা তার জবাবে বলেন, ‘আর তোমার জন্যও অনুরূপ’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯১২)।

দু‘আ

প্রশ্ন (৪৯): শোয়ার সময় যে দু‘আগুলো পড়তে হয়, ঐ দু‘আগুলো কি শোয়ার আগে পড়া সুন্নাত নাকি শুয়ে শুয়ে দু‘আগুলো পড়া যাবে?

-সাকিব আহমাদ
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর: সুন্নাত হলো, কোনো ব্যক্তি যখন বিছানাতে শয়ন করবে তখন এই দুআগুলো পাঠ করবে। কেননা এই সম্পর্কিত হাদীছগুলোতে বিছানাতে শুয়ে যিকির করার কথা বলা হয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩১২, ৬৩১৮, ৬৩২০; ছহীহ মুসলিম, হা/৭০৯০)। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ অধ্যায় বেধেছেন যে, ‘অধ্যায়: কোনো ব্যক্তি ঘুমানোর ইচ্ছা করে বিছানায় শুয়ে যা বলবে’ নামে (আল-আযকার, ৮৩ পৃ.)। তবে কেউ যদি ঘুমানোর যিকিরগুলো পড়ে বিছানায় শুয়েও পড়ে, তাহলে তা শরীআত বহির্ভূত কাজ হবে না, ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্ন (৫০) : ঘুমানোর পর রাতে যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় তাহলে কি পুনরায় ঘুমানোর দু‘আ পড়ে ঘুমাতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে পুনরায় দু‘আ পড়ে ঘুমানোর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি নবী করীম ﷺ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর ছালাত আদায় করে পুনরায় ঘুমিয়েছেন কিন্তু দু‘আ পড়েছেন মর্মেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোনো ব্যক্তি নিজের মনের প্রশান্তির জন্য দু‘আ পড়লে সেটি ভিন্ন বিষয়।

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর সার্বিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিন!

আস-সালামু আলাইকুম

সম্মানিত সুধী! আপনারা অবগত আছেন, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (নিবন্ধন নং s-12288-2016) দেশব্যাপী শিক্ষা, সেবা ও দাওয়াহ নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে, আল-হামদুলিল্লাহ!

শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের চারটি জেলায় 'আল-জামি আহ'আস-সালাফিয়্যাহ' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে যেখানে ৪৭১০ জন শিক্ষার্থী (যাদের মধ্যে প্রায় ৩০০ জন ইয়াতীম), ২২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রায় ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

বর্তমানে রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ শাখায় আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে জমি ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে। প্রায় ৬০ বিঘা জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে, এখনো ৩০০ শতক জমি (প্রায় তিন লক্ষ টাকা শতক হারে) ক্রয় করতে হবে। অত্র শাখায় দেশের বৃহত্তম বায়তুল হামদ জামে মসজিদের কাজ চলমান, যার পাইলিং সম্পন্ন হয়েছে, ফালিল্লাহিল হামদ! মসজিদটির প্রতি তলায় সাত হাজার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবেন। বর্তমানে নিবরাস মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তানোর-গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে ৬০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে বর্তমানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

দাওয়াহর ক্ষেত্রে আদ-দাওয়া ইলাল্লাহ এর অধীনে দেশব্যাপী মসজিদভিত্তিক দ্বীন শিক্ষা প্রকল্প চলমান, যার অধীনে ইতিমধ্যে ৩০০ এর অধিক মক্তব চালু রয়েছে। ফ্রি মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সিলেবাস বিতরণ চলমান রয়েছে। এছাড়াও মাসিক আল-ইতিছামসহ বিভিন্ন বই ফ্রি বিতরণ এর কাজ চলমান রয়েছে।

উপরিউক্ত মহতী কাজগুলো এগিয়ে নিতে দ্বীনী ভাই-বোনদের সার্বিক সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সার্বিক সহযোগিতা কবুল করুন- আমীন!

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন;
মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচি

হিজরী: ১৪৪৫, ঈসায়ী: ২০২৪, বঙ্গাব্দ: ১৪৩০

(ঢাকার জন্য)

তারিখ			বার	সাহারীর শেষ সময় ঘণ্টা-মিনিট	ইফতারের সময় ঘণ্টা-মিনিট
হিজরী	ঈসায়ী	বঙ্গাব্দ			
১ রামাযান	১২ মার্চ	২৮ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৪.৫৪	০৬.০৭
২ রামাযান	১৩ মার্চ	২৯ ফাল্গুন	বুধবার	০৪.৫৪	০৬.০৭
৩ রামাযান	১৪ মার্চ	৩০ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	০৪.৫৩	০৬.০৮
৪ রামাযান	১৫ মার্চ	০১ চৈত্র	শুক্রবার	০৪.৫২	০৬.০৮
৫ রামাযান	১৬ মার্চ	০২ চৈত্র	শনিবার	০৪.৫১	০৬.০৯
৬ রামাযান	১৭ মার্চ	০৩ চৈত্র	রবিবার	০৪.৫০	০৬.০৯
৭ রামাযান	১৮ মার্চ	০৪ চৈত্র	সোমবার	০৪.৪৮	০৬.০৯
৮ রামাযান	১৯ মার্চ	০৫ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪.৪৭	০৬.১০
৯ রামাযান	২০ মার্চ	০৬ চৈত্র	বুধবার	০৪.৪৬	০৬.১০
১০ রামাযান	২১ মার্চ	০৭ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	০৪.৪৫	০৬.১১
১১ রামাযান	২২ মার্চ	০৮ চৈত্র	শুক্রবার	০৪.৪৪	০৬.১১
১২ রামাযান	২৩ মার্চ	০৯ চৈত্র	শনিবার	০৪.৪৩	০৬.১১
১৩ রামাযান	২৪ মার্চ	১০ চৈত্র	রবিবার	০৪.৪২	০৬.১২
১৪ রামাযান	২৫ মার্চ	১১ চৈত্র	সোমবার	০৪.৪১	০৬.১২
১৫ রামাযান	২৬ মার্চ	১২ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪.৪০	০৬.১২
১৬ রামাযান	২৭ মার্চ	১৩ চৈত্র	বুধবার	০৪.৩৯	০৬.১৩
১৭ রামাযান	২৮ মার্চ	১৪ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	০৪.৩৮	০৬.১৩
১৮ রামাযান	২৯ মার্চ	১৫ চৈত্র	শুক্রবার	০৪.৩৭	০৬.১৪
১৯ রামাযান	৩০ মার্চ	১৬ চৈত্র	শনিবার	০৪.৩৬	০৬.১৪
২০ রামাযান	৩১ মার্চ	১৭ চৈত্র	রবিবার	০৪.৩৫	০৬.১৪
২১ রামাযান	০১ এপ্রিল	১৮ চৈত্র	সোমবার	০৪.৩৪	০৬.১৫
২২ রামাযান	০২ এপ্রিল	১৯ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪.৩৩	০৬.১৫
২৩ রামাযান	০৩ এপ্রিল	২০ চৈত্র	বুধবার	০৪.৩১	০৬.১৫
২৪ রামাযান	০৪ এপ্রিল	২১ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	০৪.৩০	০৬.১৬
২৫ রামাযান	০৫ এপ্রিল	২২ চৈত্র	শুক্রবার	০৪.২৯	০৬.১৬
২৬ রামাযান	০৬ এপ্রিল	২৩ চৈত্র	শনিবার	০৪.২৮	০৬.১৭
২৭ রামাযান	০৭ এপ্রিল	২৪ চৈত্র	রবিবার	০৪.২৭	০৬.১৭
২৮ রামাযান	০৮ এপ্রিল	২৫ চৈত্র	সোমবার	০৪.২৬	০৬.১৮
২৯ রামাযান	০৯ এপ্রিল	২৬ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪.২৫	০৬.১৯
৩০ রামাযান	১০ এপ্রিল	২৭ চৈত্র	বুধবার	০৪.২৪	০৬.১৯

বি.দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রদর্শনের উপর নির্ভরশীল

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া (www.bmd.gov.bd) | মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) | গণনা পদ্ধতি: University of Islamic Sciences,Karachi.

বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য জেলাসমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণে অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচি দেখানো হয়েছে।

জেলাভিত্তিক সময়সূচি [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	-১	-১	-১	-১
গাজীপুর	০	০	০	০
শরিয়তপুর	+১	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	-২	-১	-১	-১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৫	+৪
মাদারীপুর	+২	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২

চট্টগাম বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৩	-৪	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৬	-৭	-৭	-৮
নোয়াখালী	-২	-৩	-৩	-৩
চাঁদপুর	০	-১	-১	-১
লক্ষীপুর	-১	-২	-২	-২
চট্টগ্রাম	-৪	-৬	-৬	-৬
কক্সবাজার	-৪	-৬	-৭	-৭
খাগড়াছড়ি	-৬	-৬	-৭	-৭
বান্দরবান	-৬	-৭	-৮	-৮

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	-৭	-৬	-৫	-৫
মৌলভীবাজার	-৬	-৫	-৫	-৫
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪	-৩
সুনামগঞ্জ	-৫	-৪	-৩	-৩

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	+১	+১	+২	+৩
ময়মনসিংহ	-১	০	০	+১
জামালপুর	+১	+২	+২	+৩
নেত্রকোণা	-২	-১	-১	০

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩
পাবনা	+৫	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৪	+৫	+৫
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭
নাটোর	+৫	+৬	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৬	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+৯	+৯
নওগাঁ	+৫	+৬	+৬	+৭

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৬	+৬	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৪	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৪	+৩	+২	+২
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+৫	+৭	+৮	+৯
দিনাজপুর	+৬	+৭	+৭	+৮
লালমনিরহাট	+২	+৪	+৫	+৫
নীলফামারী	+৪	+৬	+৭	+৮
গাইবান্ধা	+২	+৩	+৪	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৬	+৮	+৮	+৯
রংপুর	+৩	+৫	+৫	+৬
কুড়িগ্রাম	+১	+৩	+৪	+৫

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+২	+১	+১	০
পটুয়াখালী	+২	+১	০	০
পিরোজপুর	+৩	+২	+২	+১
বরিশাল	+১	০	০	০
ভোলা	০	-১	-১	-১
বরগুনা	+৩	+১	+১	০

সাহল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে; ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮)।